ক্রৌঞ্চ-মিথুনের
মিলন-সেতু

ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মিলন-সেতু

অনুরূপা দেবী



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭

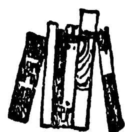
প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই মাঘ, ১৩৬৩

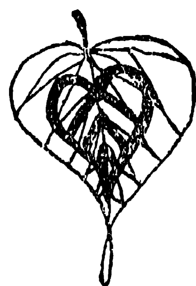
দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩







ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মিলন-সেতু

সুনীতি বন্ধুগৃহ হইতে যখন বাড়ি ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহমন লইয়া নিজের শয়ন-গৃহে চলিয়া গিয়া চুপে চুপে চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ অন্ততঃ বিছানায় তার পড়িয়া থাকার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার ভাগ্যের সে ইচ্ছা মোটেই ছিল না, তাই সামনের বারান্দা দিয়া ভিতরের অনতিবৃহৎ বসিবার ঘরখানায় ঢুকিতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল, ইহার জন্য সে মনের মধ্যে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিলেও আজকের সন্ধ্যাটায় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শুধু মনেই নয়, শরীরেও সে আজ আদৌ সুস্থ নাই। আঃ! এতটুকু, একটুখানি বিশ্রাম, অন্ততঃ খানিকটা সময়ের জন্যেও যদি সে চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিত! অতীতের স্মৃতি আজ তাকে একান্তরূপেই যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। শারীরিক শ্রমও তাকে বড় কম করিতে হয় নাই, পয়সার অভাবে হাঁটিয়াছেও সে অনেকটাই।

তার বাবা, এই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী দরজার দিকে মুখ করিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া আছেন। চেহারা তাঁর মোটের উপর একদিন বেশ ভালই ছিল, এখনও তার সবটা ধ্বংস হইতে পারে নাই, নাক-চোখে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন আজও জাগিয়া আছে, মুখের রঙটা তামার মত হইয়া গেলেও গায়ের রঙয়ে আজও সুবর্ণের আভাষ পাওয়া যায়, মাথার চুলের মধ্যভাগে টাক পড়িতেছে, চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত ও সদা-চঞ্চল, ঠোঁটের পাশে মৃদু মৃদু অর্থশূন্য মন্দ হাস্য। মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই তিনি ফোঁস করিয়া একটা ছোবল মারিলেন, "কি? এতক্ষণে এলে! আজ আমার খেতে জোটেনি সে খবরটি রাখো কিছু?"

সুনীতি অকারণেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? রান্না কি ভাল হয়নি? পাঁড়েটাকে এত করে শেখাচ্ছি তবু—"

চন্দ্রকুমার জিহ্বা-তালু সংযোগে একটা বিশেষরূপ ধ্বনি করিয়া ওর কথায় বাধা দিলেন, বলিলেন, "কোথায় তোমার পাঁড়ে? তাকে তো আমি গলা ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছি। রাঁধবে কে শুনি?"

সুনীতি একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিল, পরে সচেষ্ট আত্মসম্বরণের সহিত কহিল, "নতুন ঝিকে দিয়ে কিছু করিয়ে, না হয় বাজার থেকে আনিয়ে খেলে না কেন? তুমি তো জানতে আমার ফিরতে একটু রাত হবে!"

চন্দ্রকুমার এই কথায় যেন আত্মমর্য্যাদায় নিদারুণ আঘাত পাইলেন, অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সদর্পে ও সদম্ভে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি কি মনে ভেবেছ পাঁড়েকে বিদায় দিয়ে আমি তোমার ঝি-মাগীকে বাড়ীতে থাকতে দিয়েছি? কেন? কেন দোব? মেয়েমানুষ বলে? কিসের জন্যে? মেয়েমানুষ কি পুরুষ মানুষের চাইতে কোন কিছুতে কম? ওরা কি পুরুষের চেয়ে কম খায়, না কম পরে? খাটতে পারে কম? চুরি করে না? মিথ্যের ঝুড়ি নয়? যত সব মন্দ কাজ সংসারে হয়, সব্বার মধ্যেই থাকে ওরা, ওরা—ওরা……"

"বাবা!"

চন্দ্রকুমার সর্ব্বশরীরে একটা ঝটকা দিয়া আধফেরা হইয়া দাঁড়াইলেন, মুখে একটা তীব্র বিদ্রূপের কুটিল হাস্য তাঁর ফুটিয়া উঠিল, "হ্যাঁগো হ্যাঁ! তোমার গায়ে তো লাগতেই পারে, মেয়ে-মানুষ কি-না! কিন্তু সত্যি কথা বলবো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো, তোমার ভাল না লাগলেও বলবো,—শুনতে পেলে?"

সুনীতি অতি মৃদু একটা নিশ্বাস ভিতরে ভিতরে চাপিয়া ফেলিয়া· সংযত-কণ্ঠে উত্তর করিল, "শুনেছি।"

চন্দ্রকুমার নিজের খেয়ালেই যথাপূর্ব্ব বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ শুনতেই হবে,—হবেই শুনতে, না শুনলে আমি ছাড়বো কেন ? কেন, কেন, কেন ছাড়বো শুনি ? আমার বাড়ীতে আমি কর্ত্তা নই ?" চিরটা কাল ধরে শুনে আসছি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম ! আজকের দিনে কিসের জন্যে তার ব্যতিক্রম হবে শুনি ? হঠাৎ কি পৃথিবীটা সূয্যির আকর্ষণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ? কিছুতেই না, কিছুতেই না, আমার যা খুসী হবে আমি করবো,—ঝি-চাকর, বামুনদিদি, বামুন-ঠাকুর যাকে ইচ্ছে হবে তাড়িয়ে দোব, দোবই দোব, কি করতে পারবে তুমি সুনীতি ? পারবে কিছু করতে ?"

সুনীতি কি বলিবে ? সে স্তব্ধ স্থির দাঁড়াইয়া রহিল, অথচ সে জানে তাকে এখনই রান্নাঘরের দিকে যাইতে হইবে, না গেলে রাত্রের আহার্য্য প্রস্তুত হইবে না। বাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাণীটী পর্য্যন্ত নাই।

চন্দ্রকুমার কিন্তু মেয়ের নীরব ঔদাস্য পছন্দ করিলেন না, আরও খানিকটা উত্তেজিত হইয়া কথার উপর জোর দিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কি গো ! চুপ করে রৈলে কেন ? মনে করচো—পারবে আমায় বাধা দিতে, না ? কিন্তু এই আমি একটি কথায় বলে দিলুম তোমাকে, সে তুমি, তুমি তো তুমি, তোমার বাবা এলেও পারবে না। সে যা' করবো সে শুধু আমি, আমিই করবো। বুঝতে পেরেছ ? হ্যাঁ কি না শীগ্‌গির বলো, শীগ্‌গির—"

এবার আর কথা না কহিলেই নয় দেখিয়া মৃদু নিক্ষিপ্তশ্বাসে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে সুনীতি উত্তর করিল, "বুঝেছি বাবা, আমি এখন রান্না ঘরে যাচ্ছি……"

সে পিছন ফিরিয়া চলিতে উদ্যত হইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল, চন্দ্রকুমার ডাক দিয়াছেন। সুনীতি ফিরিয়া দাঁড়াইলে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "ছাই বুঝেছ! যদি বুঝতেই পারতে তা'হলে কি আমায় বলতে না যে, 'আমার বাবা তো তুমিই, তবে আবার বলা হচ্ছে কেন যে তোমার বাবা এলেও পারবে না'! বাঃ কি লেখাপড়াই শিখলি এতদিন ধরে? একটা 'হক' কথা বলতে ভরসা রাখিস্ না! আরে, চল্লি কোথায়? শোন্, শোন্, রান্না আর করতে তোকে হবে না, না হয় আজ নাই বা খেলুম! কি, নাঃ যা, যা, রাঁধগে যা, নাই বা রাঁধবি কেন? কেন শুনি? খেতে দিচ্ছিনে তোকে? ও-সব কিনা অম্‌নি হয়? মাগ্‌না নাকি? একটা মেয়েছানা পোষা বড় চাট্টিখানি কথা কিনা! রাঁধবি নাতো কি করবি? মেয়েমানুষে তিন তিনটে পাশ করেছে বলে কি বাপকে কিং জর্জ্জ করে দিয়েছে নাকি? যা, যা,......"

সুনীতি এ অপমানের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেল না, বৎসরাবধি এ সমস্ত কথা সে ত অহোরাত্রই উঠিতে বসিতে ক্রমাগতই শুনিতেছে। এর চেয়ে আরও কত কত মন্দ কথাও তাকে শুনিতে হইয়াছে, যে সব কথা অপর কেহ মুখে উচ্চারণ করিতে সাহস করিলে চন্দ্রকুমার হয়ত স্বহস্তে তাকে চাবুক-পেটা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, কিন্তু "তেহি নো দিবসাগতাঃ" চন্দ্রকুমার আজতো আর সে চন্দ্রকুমার নাই!

দুই

ঝি নাই, ঠিকে ঝি হইলেও বাড়ীর মোটা কাজগুলি সে-ই দু'বেলা করিয়া দিয়া যায়, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল-বাটনা, ঝাঁট-পাট সমস্তই; পাঁড়ে শুধু রাঁধেই না—বাজারও করে, খামখেয়ালী গৃহস্বামীর ফাইফরমাস সমস্তই সে খাটে, এক রান্না সাতবার করিয়া গরম

করে, চালে একটি ধান একটি কাঁকর থাকিলে রক্ষা থাকে না, রাঁন্নায় ঝাল হইলে বাটীশুদ্ধ ব্যঞ্জন তার গায়ে গিয়া পড়ে, ঝাল নুন কম হইলে চারিদিকে ছড়াছড়ি হয়, তৎক্ষণাৎ নূতন তরকারী মাছ রাঁধিয়া দিতে হয়। অবশ্য সময় সময় নূতন করিয়া রান্না করিতেও যে হয় না, তাও নয়। সুনীতিরও তার নিজের অংশের জিনিষ-গুলিকে কখনও মশলা বাড়াইয়া, কখনও মশলা ধুইয়া নূতন মশলা দিয়া নবীন মূর্ত্তিতে সরবরাহ করিতে হইয়া থাকে। সুনীতি নুন লঙ্কা তেঁতুলগোলা দিয়া ভাত যেটুকু না খাইলে নয়, খায়; পাঁড়ে দই মিষ্টির পয়সা পায়। এরকম উপদ্রব বেশীদিন কে সহিবে? বামুন ঠাক্রুণ দুজন দুমাসও কাটাইতে পারে নাই, তারপর কতজনই আসিল গেল। প্রাদেশিকতার কোনই বাছবিচার করা হয় নাই! পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বোত্তর-অংশের সমস্ত জেলার, উড়িষ্যা বিহারের দার-ভাঙ্গা, ভাগলপুর, পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিমের গোরখপুর কেহই এ বাড়ীর রান্নাঘরে পদার্পণ করিতে বাকি থাকে নাই, যে একবার আসিয়াছে, সে আর তো আসে না এবং সাধ্যপক্ষে অপরকেও আসিতে বাধা দেয়। এক আধজন দুঃসাহসী মুখের উপর জবাব করিতে গিয়া মারও তো খাইয়াছে। লোক পাওয়া এ বাড়ীতে খুবই কঠিন।

সুনীতি ভোরে উঠিয়া বাসি-বাসন পোড়া-কড়া লইয়া মাজিতে বসিল। রান্নাঘর সে রাত্রেই রান্নার পর ধুইয়া রাখিয়াছে। উনান ধরিতে দেরি হইবে, চায়ের কেৎলি ও সমস্ত সরঞ্জাম সে তেলভরা প্রাইমাস ষ্টোভের কাছে সাজাইয়া রাখিয়া বাসনগুলি দ্রুতহস্তে মাজিতেছিল। বাসনমাজা কাজটাতেই বড় বেশী কষ্ট হয়, বাবা যদি ঝিটাকেও অন্ততঃ না তাড়াইতেন। কিন্তু একথা ভাবিয়া লাভ কি? তার বাবা যদি 'বাবাই' থাকতেন তবে এসব অস্বাভাবিক

কাণ্ড করিবেনই বা কেন ? একি তার পূর্ব্বাপর পরিচিত সেই পরম স্নেহময় পিতা ? মাত্র তিনটি বৎসর, তিন বৎসর তার মা মরিয়াছেন আর এরই মধ্যে তাঁর এই অধঃপতন ! সুনীতির মানস-নেত্রে ফুটিয়া উঠিল তার মায়ের মুখ, আপনার শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে অতি সংযত অথচ স্নিগ্ধ সহাস্য মুখে যেন পরম ঔদার্য্য মাখানো, কি অপূর্ব্ব দর্শনাই যে ছিলেন তিনি ! বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হইয়াছিল, শরীর মনে কোথাও এতটুকু ক্লান্তি দেখা দেয় নাই, তেমনি তাঁর স্বামী-প্রেমের পরিপূর্ণ সরোবরেও না। ঠিক সেই তরুণ বয়সের মতই চন্দ্রকুমার স্ত্রীর আশেপাশে মুগ্ধ মধুপের মতই প্রেমের গুঞ্জন গাহিয়া দুটি জীবনকে চিরশ্যামলতায় নবীন করিয়া ভরাইয়া রাখিয়াছিলেন। সংসার ছিল অভাবহীন, জীবন ছিল পরিপূর্ণ। সেবাকুশল শুচিতায় সমস্তই ছিল মধুরতম। হাস্যে-রহস্যে সুপ্রফুল্ল দিনগুলি ছিল ঠিক যেন অব্যাহত একটি অপূর্ব্ব ছন্দে গাঁথা।

সহসা মেঘ না জমিতেই বাজ পড়িল। সুনীতির মা সুকুমারী অকস্মাৎ মারা গেলেন, সংসারে লাগিল আগুন, সে আগুন ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত সংসারকে, তাঁর পরিত্যক্ত পতি-পুত্রীকে ভস্মীভূত করিতেছে, ছাই হইয়া যাইতে বেশী আর বাকিও নাই। চন্দ্রকুমার পত্নীবিয়োগে মেয়েদের বিধবা হওয়ার চেয়েও বড় বেশী শোকার্ত্ত হইলেন, তাদেরই মত আমিষ আহার ত্যাগ করিলেন, চাকরী ছাড়িয়া অসময়ের পেন্সনে যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি স্বীকার করিলেন, গীতা পাঠে যোগবাশিষ্ট রামায়ণে চিত্ত ঢালিয়া দিলেন ; কিন্তু বেশীদিন এভাবও তাঁর রহিল না, এটা শ্মশান-বৈরাগ্যের মতই মাসকতক চলিয়াছিল এবং সুনীতির পক্ষে তখনও ব্যাপারটা খুবই শান্তির ব্যাপার হয় নাই। স্নান নাই, আহার নাই, সারা দিনরাত্রি কাতর দীর্ঘশ্বাস,

চাপা ক্রন্দনে অপগতাকে সকাতর আহ্বান, মাতৃশোকাতুরা নিজের দুঃখেই যথেষ্ট অভিভূত হইয়া আছে, তার উপর বাপের এতখানি কষ্ট সহ্য করা তার পক্ষে অসহনীয় মনে হইত। অথচ নিজের কষ্ট ভুলিয়া তাঁকেই একান্ত স্নেহে ও শ্রদ্ধায় নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া থাকিত। বি-এ পরীক্ষার পর এম-এ পড়িবার যে কল্পনা ছিল, সে ইচ্ছা তাঁর জন্য সে ত্যাগ করিল, অসহায় শোকাচ্ছন্ন বাপকে সে কার কাছে রাখিয়া দিয়া কলিকাতায় পড়িতে যাইবে!

সকল দেশেই প্রবাদ আছে, 'অতির গতি ভাল নয়' 'অতি দর্প হতা লঙ্কা' ইত্যাদি, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল! চন্দ্রকুমারের অতি শোক তাঁর অতিশয় পতনেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইল। গুরু সহায়তা ভিন্ন শাস্ত্রাধ্যায়ন অতি সাধারণ বুদ্ধিতে তার সত্যমূর্ত্তিতে প্রকটিত হয় না, ঝোঁকের মাথায় পুঁথির পাতা উল্টাইয়া যাওয়াই চলে, চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মের বীজ যথাযথ ভাবে অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত ও পুষ্প-প্রসবিনী ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

কিছুদিন পরে একান্ত নিরসবোধে শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকুমার সাইকীক সোসাইটিতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। 'লেড বিটার', 'অলিভার লজ', 'ম্যাডাম, ব্ল্যাভাটস্কি' ও অন্যান্য কিছু কিছু পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি একান্ত আগ্রহে সংগ্রহ ও পাঠ করিতে লাগিলেন, মনে হইল বুঝি এইবার একটা শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন! ইহলোকের ও পরলোকের মাঝখানে যে একটা অতি গুহ্য এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম মিলন-সেতু এই উভয় লোকের অধিবাসীদের একান্তরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এইবার সেই গুপ্ত পথের সন্ধান লাভ করিয়া তিনি বুঝি সেই সেতুটাকে পার হইতে পারিয়াছেন! আর কি? এখন তাঁর প্রবাসিনী-প্রিয়া আর তাঁর অনধিগম্যা রহিলেন না, তাঁর অন্তরের নাস্তিত্বের শূন্যতা এইবার সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল!

একদিন একান্ত আগ্রহভরে সুনীতিকে আসিয়া বলিলেন, "আজ একজন মিডিয়ামের আসবার কথা আছে, তাঁর কাছে তোমার মা'র খবর পাবো, তিনি নিশ্চয় আসবেন, তুমি যাবে ?"

সুনীতি তার বাবার পুরাণো সোয়েটারটা রিপু করিতেছিল, হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "যাবো বাবা, আমায় নিয়ে চলো।"

"বেশ তৈরী হও,—" বলিয়া চন্দ্রকুমার স্ত্রীর জীবিতকালের মত কোঁচান মিহি ধুতি, হাতে গিলা-করা আদ্ধির পাঞ্জাবী ও পাতলা উড়ানী পরিয়া সাজিয়া আসিলেন ; স্ত্রীর মৃত্যুর পর এসব আলমারী হইতে বাহির করা হয় নাই। এতকালের পরিত্যক্ত সোয়েডের পামশু-জোড়া পায়ে ফোস্কা পড়াইয়া দিতে থাকিলেও তাদের মোহ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, আজ বহুদিনের অদর্শনের সমস্ত বিরহ বেদনা প্রশমিত করিয়া, তপ্তনিদাঘের সমুদয় তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া নব বর্ষার স্নিগ্ধ সলিল সম্পাতের মত সুকুমারী আসিবে, সে তো তাঁর এমন অপরিচ্ছন্ন বিশৃঙ্খল বেশভূষা সহ্য করিতে পারিবে না !

মিডিয়াম এদেশী নয়, একজন বিদেশী পুরুষ। তিনি প্রথমতঃ আর একজনের বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে মিলন-সেতু বাঁধিয়া দিয়া তারপর চন্দ্রকুমারের প্রতি প্রশ্ন করিলেন ঃ

"কা'কে চান ?"

আবেগ বিগলিত বিচলিত কণ্ঠে চন্দ্রকুমার উত্তর করিলেন, "আমার স্ত্রীকে, আমার সুকুমারীকে—"

"আমি বলে দেখি,—হ্যালো মিষ্টার স্মিথ ! আপনি কি এঁর স্ত্রীকে ডেকে আনতে পারবেন ?—"

প্রসারিত ফুলস্কেপটিতে লিখিত হইল, আমি তো তাঁকে চিনি না, তবে এইখানে একজন লেডি দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঐ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন ;—হতে পারে তিনিই ওঁর স্ত্রী।"

"আপনি প্রশ্ন করুন—"

চন্দ্রকুমার দু'তিনবারের চেষ্টার পর গলা সাফ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"সুকু ? এসেছ ?"—

উত্তর হইল, "অনেকক্ষণ ! আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি।"

চন্দ্রকুমারের চোখ দুইটা তার চশমার পরকলার মধ্য দিয়া চকচকে হইয়া উঠিল, আনন্দস্মিত মুখে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "সত্যি থাকো ? সমস্তক্ষণ ? তবে আমায় দেখা দাও না কেন ?"

উত্তর হইল, "কি মজার কথাই বল্লে ! দেখা দিই, আর তুমি ভূত দেখেছ বলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করো আর কি ! রোজা ডেকে আমায় সরষে-পড়া খাওয়াও।"

চন্দ্রকুমারের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি সলিলার্দ্রতায় ঝাপ্সা হইয়া গেল, তিনি সক্ষোভে উচ্চারণ করিলেন, "আমায় তুমি তাই ভাবো !"

"হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা, অমন দশা করে থাকো কেন ?"

"কেমন দশা ?"

"বাঃ জানো না যেন ! নাপিতকে ধোপাকে ভাতে মেরে দর্জ্জিকে বয়কট করে, কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তি হয়ে, ও সব কি হচ্চে ?"

চন্দ্রকুমার একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে যেন সমস্ত মনটাকে একমুহূর্ত্তে হাল্কা করিয়া ফেলিলেন, তাঁর সমুদয় আত্মত্যাগ তা' হইলে সার্থকতা

লাভ করিয়াছে ! বলিলেন, আগ্রহ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় ছেড়ে কিছুই আমার ভাল লাগে না যে সুকু ! তুমি কেন আমায় ছেড়ে গেলে রাণি ?"

অদৃশ্য সুকু উত্তরে লিখিল, "আমি কি ইচ্ছে করে চলে গেছি নাকি ? নিয়তি আমায় টেনে এনেছে, কি কষ্ট, তাই বলে কি তোমায় অত কুড়ে হলে কখন চলে ?"

"কুড়ে !" সবিস্ময় অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ। "কুড়ে !"

"তা' না তো কি ! চাকরী ছাড়লে কি জন্যে ? পুরুষ মানুষ কাজকর্ম্ম ছেড়ে ঘরে বসে থাকলে শরীর মন ভাল থাকে কখন ? কি চেহারা করেছ, আরসিতে কি চেয়েও দেখ না ?"

আবার মনটা প্রসাদ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল : "কি হবে শরীর নিয়ে, তোমার কাছে যত শীগ্‌গির যেতে পারি ততই তো ভাল।"

"আহা কি কথাই বল্লেন ! আর আমার মেয়েটার ! ওর কি বিয়ে দেবে না ? পড়া তো ছাড়িয়েই দিয়েছো !"

ঠিক সুকুমারীরই চরিত্রগত পরিচয় ! ঈষৎ অভিমানে চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "পড়া আমি ওর ছাড়াইনি সুকু ! ও নিজেই ছেড়েছে। আর বিয়ের কথা তো একটা দুটো হচ্চে, ওই তো বিয়ে করতে রাজী হয় না।"

"হ্যাঁ, সেও তোমারই জন্যে ! তুমি যদি সহজ ভাবে থাকতে, ওকে তোমার জন্যে অতখানি ভাবতে বা কষ্ট পেতে হতো না ! আচ্ছা আজ যাই, না না আর থাকতে পারছি না, কষ্ট হচ্চে।"

সেই পতি-পত্নী, সেই মান-অভিমান, সেই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের ঘরোয়া হিসাব-নিকাশ ! তবে আর যায় কি ? হারায় কোথায় ? শুধু যদি একবার চোখের দেখাটা দেখা যাইত !

চন্দ্রকুমার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যেখানে যত ছোট-বড় মিডিয়ামের খবর সংগ্রহ করিতে পারিল, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সত্যই তো আর ব্যাপারটা অত সহজসাধ্য নয়! টেবিল ঠোকা, প্ল্যানচেট নামান, অনেক কিছুই হইল, তত্রাচ এমন কিছুই মিলিল না যাহাতে অন্তর হইতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে, সত্যই তার অপগতা প্রিয়-পত্নী বিদেহী সুকুমারীই তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে! সে রহস্যালাপ, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তো কোথাও মিলিল না!

প্রায় একটি বৎসর পরে আবার সেই পূর্ব্বতন মিডিয়াম তাদের "সাইকীক্যাল রিসার্চ সোসাইটীতে" দেখা দিলেন। চন্দ্রকুমার সুনীতিকে খবর না দিলেও সে তার বাবার সাজসজ্জার বহর দেখিয়া আন্দাজে ধরিয়া ছিল,—এবার সঙ্গ লইল।

সুকুমারী এবার অন্য সুরে কথা কহিল, বলিল, "কেন তুমি অমন করে আমায় দিনরাত টানাটানি করছো? নিজেও দুঃখ পাচ্চো, আমাকেও দিচ্চো, আমায় ভুলে যাবার চেষ্টা কেন করছো না?"

আহতের আর্ত্তস্বরে চন্দ্রকুমার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিলেন, "তোমায় ভুলে যেতে বলছো? বেশ! তা'হলে আমায় তুমি আর চাও না? তোমায় আমি স্মরণ করে দুঃখ দিচ্চি? এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছ তুমি?"

উত্তর দিল সুকুমারীর বিদেহী আত্মা,—না সূক্ষ্মদেহী সুকুমারী, আত্মা তো আর কথা কয় না, কহিল,—অর্থাৎ পেনসিলে ভর দিয়া লিখাইল—

"হ্যাঁ সব্বাই হয়, নিষ্ঠুর না হলে যদি পৃথিবীর দিকে শতচক্ষু হয়ে চেয়েই থাকতো,—উন্নতি করতো কেমন করে? তুমি আমায় আর ডেকো না, ডাকলেও আর আমি আসবো না।"

"উঃ! এত নিষ্ঠুর তুমি কেমন ক'রে হ'লে সুকুমারী? আমার প্রতি এতটুকু টানও কি আর তোমার নেই? অথচ আমি তোমার জন্যে অহর্নিশ কেঁদে ফিরছি!"

অদৃশ্য হস্তের সবল অক্ষরে লিখিত হইল, "তা জানি, আর সেই জন্যেই আমি তোমার ডাকে সাড়া দোব না স্থির করেছি। মৃতের পিছনে ছুটে বেড়ালে ইহপরলোকের কোন উপকারই নেই। তার চেয়ে মেয়েটার ভাল বিয়ে,—তা'তে ভবিষ্যতে তোমারও মঙ্গল হবে।"

চন্দ্রকুমার সুগভীর অভিমানভরে কহিয়া উঠিলেন, "তুমিই যদি আমায় ভুলে যাও, তবে ইহপরলোকে ভাল মন্দ কি হলো না হলো, কি আমার তাতে বয়ে গেল? চাই না আমার ভবিষ্যতের মঙ্গল! তুমি আমায় ত্যাগ করো না।"

অতি দুঃখিত থামা থামা কলমে এই কথাগুলি লিখিত হইল,—"নিয়তি অখণ্ডনীয় হ'লেও তার নিমিত্ত কারণ আমিই তবে হলেম! কিন্তু কি করবো এ আমারও যে নিয়তি! এখনও শান্ত হ'বার চেষ্টা করো, গুরুমন্ত্র গ্রহণ করো, তাতে রুচি না হয় এই মন্ত্র জপো।"

"এই মন্ত্র" সে লিখিয়া দিল।—"মন দিয়ে সর্ব্বদা জপ করো, না করলে দারুণ অমঙ্গল ঘটতে পারে। সাবধান করে দিচ্ছি, এখনও আত্মস্থ হও। আমি চল্লেম,—আর ডেকো না। খুকি! তুই একটিও কথা বলতে পারলিনে মা? তোকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হচ্চে বিস্তর! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার শেষে ভালই হবে।"

চন্দ্রকুমার উচ্চ চীৎকারে ডাকিয়া উঠিলেন, "সুকুমারী! সুকুমারী! সুকু! সুকু! সুকু!" তারপর আছড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া সম্পূর্ণ চেতনা হারাইলেন; যখন সংজ্ঞা ফিরিল, মস্তিস্ক তাঁর সম্পূর্ণরূপেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

সেই যে পরলোক হইতে গভীর ব্যথাহত চিত্তের নিগূঢ় সাবধানতার বাণী একটা নিদারুণ অমঙ্গলের নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সে যে এমন মুখামুখি আগাইয়া আসিয়া আক্রমণোদ্যত হইয়াছিল, কে তাহা জানিত! মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া চলিয়া গেল, এর কোনই ব্যতিক্রম ঘটিল না। চন্দ্রকুমার তাঁর চন্দ্রকিরণেরই মত পরম রমণীয় স্নিগ্ধ শীতলতা পরিহার পূর্ব্বক দিনের পর দিন ক্রমশঃই তপ্ত নিদাঘের উগ্রজ্বালা তাঁর চারিদিকে বিচ্ছুরিত করিতে থাকিলেন; ফলে নিজের ত যা' হইল তা হইলই,—দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিতে লাগিল কন্যা সুনীতি। জ্বালার তার পরিসীমা রহিল না। কলেজ সে ছাড়িয়াছে, এম-এ পরীক্ষা না হয় নাই বা দিল, এমন কিছু বড় ব্যাপার এটা নয়, বাপের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করা সে কিছু তার পক্ষে খুব বেশী কথা নয়; কিন্তু এই যে দিনের পর দিন সমস্ত মানসিক ব্যাপারের উপর এতখানি শারীরিক কষ্ট, অনভ্যস্ত শরীর যে আর এই ক্লেশভার বহন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। মাথা ঘুরিয়া কতদিন রান্নাঘরে পড়ে পড়ে হয়, কোনমতে সামলাইয়া লয়, বুক প্রায়ই ধড়ফড় করে, দেহ শীর্ণ, বর্ণ মলিন হইয়া যাইতেছে, তার আতঙ্ক-বিস্ফারিত সুন্দর দুটি চোখের কোলে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কালির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ কতই বা তার বয়স! এই বয়সেই তো মেয়েরা খাইয়া পরিয়া পড়াশোনা করিয়া ভবিষ্যতের সুখময় সানন্দ জীবনের জন্য নিজেদের তৈরী করিয়া লয়। সুনীতির সকরুণ শান্ত মুখখানি দেখিলেই একটি আলোক-শিখা নেবা গৃহ-প্রদীপের কথা স্বতঃই মনে পড়ে।

খিড়কীর দরজাটির বাহিরের দিকের কড়াটি খুট খুট করিয়া ঈষৎ নড়িল, কে যেন অতি মৃদু সঙ্কোচে সন্দেহ-ভীরু হস্তে সসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কে? সুনীতি ছাইমাখা হাত ধুইয়া

উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া নূতন-বিতাড়িতা ঝি শিবানীর মা। সুনীতির কাছে আসিয়া গলার স্বর নামাইয়া সে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিল, বলিল, "মাইনেটা দেবে দিদিমণি? মাস কাবার ত আজ আটদিন হয়ে গেছে, বাড়ীউলি বড্ড তাগাদা করছে, দিয়ে দেবে?"

সুনীতি যেন একটা পথ পাইল, বলিল, "তা' দিচ্চি, তুই চলে গেলি কেন ভাই, জানিস্ তো'বাবার কি অবস্থা, তোদের কি একটুও মায়া হয় না রে আমার 'পরে।"

তার কথাগুলো শেষদিকে গাঢ় হইয়া কণ্ঠের মধ্যে জড়াইয়া আসিল। শিবানীর মা কহিল, "সে তো সবই জানি দিদি, কি করবো, আমি নিজে তো চলে যাইনি, শেষকালে ধাক্কা দিতে দিতে 'বেরো মাগী, বেরো মাগী' বলতে বলতে সদর রাস্তায় বার করে দিয়ে ফটক বন্ধ করে দিয়ে এলেন, আমি কি করবো বল? সত্যি বলছি, যে দিব্যি করতে বলো করতে পারি। সারারাতটা তোমার কথাই ভেবেছি। ঘুমুতে পারিনি তিলেকের জন্যেও।"

সুনীতির আহতচিত্ত আর যেন আঘাত-ব্যথা সহিতে পারিতেছিল না, নিদারুণ গুমোটের পর এতটুকু হাওয়ার ছোঁয়াতেই তাই তার দু' চোখ ফাটিয়া একরাশি উষ্ণ জলের ঝরণা ঝর ঝর করিয়া দু'গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে ব্যগ্র কাতরতার সহিত ঝিয়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিল; "আমি বড্ড একলা শিবুর-মা, তুমি আমার মুখ চাও, তুমি ফিরে এস ভাই, ফিরে এস।"

এ-সব শ্রেণীর ভিতর স্বার্থান্ধতা যদিও খুবই প্রবল, তথাপি মানুষ মাত্রেরই মধ্যে সকলকারই একটা দুর্ব্বল স্থান আছে, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেখানে স্পর্শ লাগিলে তাকে এক মুহূর্ত্তেই উদারতর করিয়া তুলিতে তখন আর বাধে না। সে আজ যে মাহিনার ছুতা করিয়া আসিয়া-

ছিল, এটা এই সুনীতির প্রতি অনুকম্পাতেই, নহিলে মাহিনা সে প্রয়োজন মত লইবে বলিয়া নিজেই সুনীতির কাছে জমা রাখিয়াছিল। তথাপি দ্বিধাগ্রস্থভাবে কহিল, "থাকলুম না হয়, কিন্তু বাবু যদি থাকতে না দেয়, দেখেছ তো, মানুষ জনের উপর আজকাল বড্ডই নারাজ। কেবলি বলে, 'রাক্ষসের মতন গবগবিয়ে সব খাচ্চে,—কোন দিন আমায় খাবে, বিদায় করো, বিদায় করো'।"

"লক্ষ্মী দিদি! তুমি খিড়কী দিয়ে এসে কাজ করে দিয়ে বেরিয়ে যেও, আমায় বাঁচাও, বাবা দেখতে পাবেন না।"

ঝি এ প্রস্তাবে রাজী হইল।

তিন

পরের দিন সকাল বেলায় চন্দ্রকুমার যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, তখন তিনি আর সে মানুষই ন'ন। চোরের মতন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিতেছিলেন, হঠাৎ সামনা-সামনি দেখা হইয়া গেল সুনীতির সঙ্গে। সে তখন ত্রস্তভাবে গরম জলের কেৎলী ঝাড়ন দিয়া ধরিয়া ভিতর দিকের দরজাটা দিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল। চন্দ্রকুমার সুস্পষ্টরূপেই চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁর ম্লান মুখ ম্লানতর হইয়া উঠিল, সঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিয়া দরজার সামনেই দাঁড়াইয়া পড়িলেন, অগ্রসর হইতে আর পা উঠিল না। সুনীতি অতটা লক্ষ্য করে নাই, আর করিলেই বা কি, এরকম ঘটনা তো বৎসর কাটিতে যায়, তাদের নৈমিত্তিক নয়, নিত্যকারই ঘটনা। প্রচণ্ড রাগে জ্ঞান-শূন্য হইয়া লোক তাড়ানো এবং তারপর অনুতপ্ত হইয়া মেয়ের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা, এমন কি, সেই বিতাড়িতা যদি তখন সম্মুখে থাকে, তাদের কাছেও হাতে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কিছুমাত্র তাঁর বাধে না, আবার বিনা নোটিশেই অকস্মাৎ মার মার শব্দে পূর্ব্বকৃত

ব্যাপারেরই পুনরভিনয় করা। উঃ নিদারুণ,—নিদারুণ সে সব দৃশ্য, সহ্য করা সে-যে কি কঠিন !

ছাকনী দিয়া চা ছাকিতে ছাকিতে সুনীতি ডাকিল, "এসো বাবা ! ততক্ষণ মাখম-মিছরিটা খেয়ে নাও।" সে অন্য হাত দিয়া কাঁচের প্লেটে সাজানো মাখম-মিশ্রী, খোসা-ছাড়ানো বাদাম ও ভিজে মুগের সঙ্গে বাটা চিনি এবং ক্রীম-লাগানো টোষ্ট দুখানি বাপের চেয়ারের দিকে ঠেলিয়া দিল।

চন্দ্রকুমার কবিরাজী মতের এবং পূর্ব্বাভ্যাস মতন ঠাণ্ডা ও গরম প্রেসক্রিপ্সন একসঙ্গেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, আপত্তি করিয়া কোন লাভই ছিল না, তাই সুনীতি করে নাই। মেয়ের সহজ কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে চোখ তুলিয়া দেখিয়া তাঁহার একটু যেন সঙ্কোচ কাটিল, অগ্রসর হইয়া আসন গ্রহণ করিতে করিতে স্নেহ-করুণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "দেখিস্ মা ! হাত পোড়াস্নি যেন, ঢের সময় আছে, তোকে অত ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

সুনীতির চাপা ঠোঁটের কোণের কাছে একটি বিন্দু দুঃখের হাসি অতি সন্তর্পণে ফোটে ফোটে হইয়াও সাহস করিয়া ফুটিতে পারিল না, সক্ষোভে সেটুকুকে সে ভিতরে চাপিয়া লইতেই মনে পড়িল এই কথাটাই—তার বাপ ইতঃপূর্ব্বে এক পেয়ালা তৈরি চা তাঁর দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে গেলেও কতবারই না তাকে আন্তরিকভাবেই বলিয়াছেন। "বাবা, কিচ্ছু খাচ্চো না যে, খাও—"

চন্দ্রকুমারের যেন চট্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল, "অ্যাঁ, খাচ্চি না ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাচ্চি নাই তো, নাঃ—খাবো না, তুই কি রকম রোগা হয়ে গেছিস্, আর আমি ভাল-মন্দ খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন পেঁড়ো-সুর হচ্চি,—কেন ? দেখছিস্ না ? কত মোটা হয়ে গেছি। তোর মা যদি এখন আমায় দেখে, চিনতে পারে ? —কক্ষনো পারে না।"

সুনীতি প্রমাদ গণিল, তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল, "নিশ্চয় পারেন। মা তোমায় কত রকম ভাল ভাল জিনিষ তৈরী করে করে খাওয়াতেন, সে কি রোগা হ'বার জন্যে? তুমি না খেলে তাঁর কষ্ট হবে না?"

সর্ব্বনাশ! কেনই বা সে এমন কথাটা হঠাৎ বাপকে খুসী করিবার লোভে বলিয়া ফেলিয়াছিল! —উঃ কেন মরিতে বলিল?

ঝন্ ঝন্ শব্দে হাতের প্লেটখানা টান মারিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চন্দ্রকুমার লাফাইয়া উঠিয়া দু' হাত উর্দ্ধে তুলিয়া অকস্মাৎ কানফাটা চীৎকার আরম্ভ করিলেন:

"কে বল্লে তোকে? কে বল্লে তোকে? তার কষ্ট হবে কে তোকে বলেছে? বল্? বল্? শীগ্ গির করে বল্—বল্—না হলে আজ তোকে আমি আস্ত পুঁতে ফেলবো। মেয়ে বলে কিছু বলি না বলে! তার যদি আমার জন্যে এতটুকুও কষ্ট হতো, তা'হলে সে বলতে পারতো, 'ডাকলেও আর আসবো না'! নেমকহারাম! বেইমান কোথাকার! আর তুই, তুইও তো তারই গর্ভের মেয়ে, —কই, বলতে পারলি না তো, কি করে তুই জানলি যে তার কষ্ট হয়! বল্ কে তোকে এ-কথা বলেছে? বল্, না হলে তোকে আজ আমি দু-খানা করে কেটে ফেলে ফাঁসি যাবো।"

"আমিই তো ও-কথা বলেছি ওঁকে,—আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন দেখি।"

সুনীতির হাত কাঁপিয়া চায়ের পেয়ালার খানিকটা চা চল্‌কাইয়া টেবিল ক্লথের উপর পড়িয়া গেল, বাপকে দিবার জন্য সে পেয়ালাটা হাতে লইয়াছিল, নামাইয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

"কি? কি বল্লে? তুমি বলেছ? তুমি? তুমি? কে তুমি? তুমি কি জানো যে ও-কথা ওকে বলেছ? সুকুমারীর সঙ্গে তোমার

কি দেখা হয়েছিল না কি যে, তুমি তার মনের খবর ওকে দিতে গিয়েছ? আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তোমার? বেরোও—বেরোও, গেট-আপ, গেট-আপ”—চন্দ্রকুমার আগন্তককে তাড়া করিয়া ছুটিয়া গেলেন।

যে আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রমাণ সাইজের বেশ একজন সুশ্রী যুবক সে, সাজসজ্জাও তার ভদ্রশ্রেণীর তারুণ্য-দ্যোতক, মুখের ভাবটি ভারী স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সে তার স্বভাবমধুর কণ্ঠে ধীরস্বরে উত্তর করিল, “আমার চেনা একজন মিডিয়াম আছেন, আমি তাঁরই ‘থ্রু’তে সব্বার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারি কি না,—আপনার কন্যা আমাদের কলেজে পড়তেন, ডিবেটিং ক্লাবে আলাপও একটু-আধটু হয়েছিল, সেদিন হঠাৎ ট্রামে দেখা হ’তে উনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কোন মিডিয়ামকে আমি চিনি কি না, তাই বাধ্য হয়েই একজনকার খবর ওঁকে আজ বলতে এসেছি। খুব ভাল মিডিয়াম, যাকে চাইবেন, তাকেই তিনি ডেকে দেবেন। চেনা-শোনার অত শত উনি ধার ধারেন না। গ্ল্যাডষ্টোন বলুন, গ্ল্যাড-ষ্টোনকে পাবেন—চান যদি নেপোলিয়ানকে তাই তাই, সাজাহান বাদশাহকে পাওয়া যায় কি না অবশ্য আমি সেটা সঠিক বলতে পারছিনে,—কেন না সম্প্রতি পাকিস্থানে বাদশাহী করবার জন্যে যদি অবতার-টবতার হয়েই থাকেন, সেটা খোদা মালুম, নৈলে উপর মুল্লুকে থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন। তবে নাদিরশা, তৈমুর আর চেঙ্গিস্‌খাঁ অথবা রঘুডাকাতের অবতার অনেকবারই হয়ে গেছে, ওঁদের ক’টিকে শুধু মাথা খুঁড়লেও পাবেন না, যেহেতু সম্প্রতি তাঁরা রণরঙ্গে মেতে রয়েছেন।”

চন্দ্রকুমার ধৈর্য্য ধরিয়া দাঁড়াইয়া এইসব কাহিনী শুনিতেছিলেন, অসহিষ্ণু হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “ফক্কুড়ি রাখো, ধন! কোথায়

থাকে তোমার সেই মিডিয়াম? নিয়ে চলো আমাকে সেইখানে, এক্ষুণি নিয়ে চল, না গেলে ওই ডাণ্ডা দিয়ে মাথাটি ফাটিয়ে দোব।”

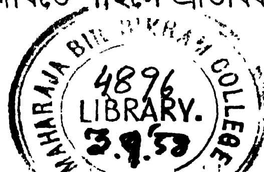
সুনীতির মুখখানা মরামুখের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, সে তার কম্পিত ওষ্ঠাধরে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা আর তা’ হইল না, হাতের ইঙ্গিতে উহাকে থামাইয়া দিয়া আগন্তুক সপ্রতিভ স্নিগ্ধ হাস্যে উত্তর দিল, “আপনাকে সেখানে কোন্ দুঃখে নিয়ে যাবো, তাঁকেই এখানে আজ রাত্রে আমি আনছি যে। এইখানে, এই তাঁর নিজস্ব বাড়ীঘরে, এইখানে এসেই না তাঁর মনটা পরিতৃপ্ত হবে। তা’ ছাড়া দেখুন, আপনি অত ভিড়ের মধ্যে ডাকতেন বলেই না তিনি ডাকলেও আসবেন না বলেছিলেন। নিজে যেচে এসে ওঁকে বল্লেন—“দেখুন, আমি হিঁদুঘরের বউ মানুষ, যতই হোক, সায়েব-টায়েবের হাত-ধরা কি আর আমি পছন্দ করতে পারি!” এ রকম কেস্ ওঁর কাছে বিস্তর এসেছে কি না,—ওঁরই কাছে আমার সে-সব কাহিনী তো শোনা। তাই বলছি, দেখছেন তো, ঠিক হুবহু তাই এক্ষেত্রেও ঘটেছে, কথায় বলে, ‘স্বভাব যায় না মলে’। আচ্ছা, সুনীতি দেবি! দিন না ওঁর চা-টা ওঁকে এগিয়ে, আর যদি বেশী থাকে তো আমাকেও এক, না হয় তো আধ পেয়ালাটাক্,—অবশ্য নিজের জন্যেও একটুখানি রাখবেন; না, না, সমস্তটা আমায় ঢেলে দিচ্ছেন কেন? আছে আরও? কই ঢালুন তো দেখি, আচ্ছা—তাহলে বিস্কুট দুটো চন্দ্রবাবু, না কি বলবো? জ্যাঠামশাই বলি? হ্যাঁ—খেয়ে নিন, আর বেশ করে তেলটি মেখে স্নান আহার করে একটুখানি নিদ্রা দিয়ে নেবেন, বৈকালে চা ইত্যাদি খেয়ে সম্পূর্ণরূপে তৈরী থাকবেন, সন্ধ্যে হলেই ওঁকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। আর আপনি সুনীতি দেবি! একটা কাজ করবেন, একটি নির্জ্জন দেখে ঘর গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে ধূপ জ্বেলে, ফুল সাজিয়ে চন্দনের ছড়া

দিয়ে একটি ছোট্ট চৌকিতে কাগজ পেনসিল রেখে দেবেন। নিজে স্নান করে একটি ক্ষৌমবস্ত্র পরবেন, কপালে দেবেন শ্বেত-চন্দনের প্রলেপ, চাই কি আপনারই হাত দিয়ে লেখা বার হ'তেও তো পারে। ওঁর সে রকম শক্তিও আছে। বেশ, সব ঠিক থাকলো। এখন প্রণাম জ্যাঠামশাই। নমস্কার সুনীতি দেবি! চল্লেম!"

অদ্ভুত! ঝড়ের মত আসিয়া তেমনি করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু কি অসাধ্য-সাধনই না সে করিয়া গেল, সে শুধু জানিল সুনীতিই। ক্ষুধিত একটা বাঘকে নিরীহ ভেড়া বানাইয়া দিয়া গেল! যে এ কাজটা করিল সে তার একান্তই অপরিচিত, অথচ এমন সব কথা যা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কেমন করিয়াই বা সে-সব কথা সে বলিয়া গেল?

চার

দিনভোর ভাবিয়া ভাবিয়াও সুনীতি এই অপূর্ব্ব রহস্যের কোন সুমীমাংসা করিতে পারে নাই—যে সকল কথা এই অপরিচিত তরুণ তার মুখের উপর বলিয়া গেল—তার মধ্যের প্রায় সমস্তটাই তো মিথ্যা। কলেজে সে এর সঙ্গে কোনদিনও পড়ে নাই, কোন ডিবেটিং ক্লাবে যোগ সে কদাপি দেয় নাই, দিবার অবসর তার কোথায় যে দিবে, ইহাকে কোনদিন যে চোখে দেখিয়াছে, এমনও তার স্মরণ হইল না। অথচ এমন সব কথা এ চৌচাপটে বলিয়া গেল, যে-কথা বাহিরের কোন লোকেরই জানা কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে কি সত্যসত্যই এ যা' বলিল সবই সত্য? অর্থাৎ তার মা-ই মিডিয়ামের মুখ দিয়া সত্যসত্যই স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে এতদিনে সম্মত হইয়া ইহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন? তিনি তো সবই দেখিতে পাইতেছেন, তবে উপায় দেখিতে পাইলে প্রতিবিধান না করিবেনই



বা কেন? তার সমস্ত শরীর আনন্দে আশ্বাসে কৃতজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দুটি চোখ দিয়া অজস্র ব্যথা-বিজড়িত আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, অভিমানে, আনন্দে সংমিশ্রিত গদগদ-কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে সে ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে লাগিল—"মা! মা! ওমা, মা! মাগো! মা আমার! আমার মা! আমার মা!"

এতদিনকার সমুদয় দুঃখ অভিমান যেন নিঃশেষ হইয়া সেই অশ্রু-জলের সঙ্গে তার মনের মধ্য হইতে মার্জ্জিত ও ধৌত হইয়া যাইতে লাগিল। অপরাধের কুণ্ঠায় মরিয়া গিয়া মনে মনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, "কত অন্যায় কথা তোমার উদ্দেশ্যে আমি বলেছি মা! স্বার্থপর বলে কত অনুযোগই যে করেছি, সে-সব তুমি নির্ব্বোধ বলে আমায় ক্ষমা করবে ত? আমি তো স্ত্রী নই, মা নই, কেমন করে তাঁদের মনের কথা বুঝতে পারবো? আমার বাবা এত দুঃখ পাচ্চেন, শুধু তোমার তাঁকে বৎসরান্তে একটি দিনের দেখা দেওয়া,—না তা'ও নয়, একটুখানি লিখে জানানো মাত্র, এইটুকুও তুমি কেন পারবে না বল্লে,—এই ভেবে কত রাগ করেছি, কিন্তু তুমি তো চুপ করে থাকতে পারোনি,—এই তো সুযোগ পেতেই আপনি ছুটে এসেছ,—একজন অপরিচিতের কাছে—"

"সুনীতি!"

বজ্র নির্ঘোষের মত আহ্বান আসিল। সচকিত সুনীতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল রুদ্র মূর্ত্তিতে চন্দ্রকুমার অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

সুনীতির দুইচক্ষে তখনও শতধারা বহিতেছিল—সে তাহা মুছিতেও ভুলিয়া গেল, হঠাৎ আবার এ হইল কি! খুবই খোস মেজাজে আজ তো চন্দ্রকুমার পরিপাটিরূপে স্নান আহার করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ঘুম ভাঙ্গিয়া সহসা এ মূর্ত্তি কেন?

কেন তাহা চন্দ্রকুমারই বলিলেন, চীৎকার শব্দে ধমক দিয়া উঠিলেন, "আজকের দিনে তোর চোখে জল কিসের জন্যে শুনি? মা আসছে ঘরে,—নিজেরই মা সে তোর, তোর সৎমাকে তো আর ঘরে আনছিনে, তবে আবাগের বেটী! তুই কাঁদিস্ কি জন্যে শুনি? কেন? কলের জলের মতন চোখের জলে সরকার ট্যাক্স বসায়নি বলে? আমায় যদি কর্পোরেশনের মেয়র করে আমি তাই করবো,—হ্যাঁ, দেখিস্ তোরা ছিঁচকাঁতুনীরা—! নিশ্চয় করবো ওই আইনটি, বাছাধনদের কাঁদার সুখটি বার করছি,—এই দেখো না!"

এই কথা! সুনীতি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, মনে এক রকম আর মুখে আর এক রকমের হাসি আনিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আমি তো কাঁদিনি বাবা! মা আসবেন, তাই সব ঝাড়া-ঝুড়ি করছিলাম কি না, ধুলো না পোকা কি একটা চোখে পড়েছিল, তার জন্যে অত জল পড়ছে। এখন তুমি চলো দেখি, চা করে আনিগে, আজ তোমার চায়ের সঙ্গে একটু গরম হালুয়া করে দিই কেমন? আর নিমকী ভেজেও রেখেছি, আগে সেগুলি পেট ভরে খেয়ে নাও,—হয়ত অনেক রাত হয়ে যাবে খেতে।"

খাবারের রেকাব টানিয়া লইয়াই চন্দ্রকুমার ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন, "এ কি করেছিস্! হালুয়াতে কর্পূর দাওনি তো! জানিসনে নাকি, এত বড় ধেড়ে মেয়ে তুই, তোর মা কি কি পছন্দ করতেন?"

সহাস্যে সুনীতি উত্তর করিল, "খেয়ে দেখেই বলো, না খেয়েই রাগ করছো কেন? কেমন? দিইনি?"

"দিয়েছিস,—কিন্তু চিনেবাদাম—"

"চামচ দিয়ে আর একটু ভাঙ্গো,—মৌরি, ছোট এলাচ, কিসমিস, চিনেবাদাম সব দিয়েছি। ভাল হয়নি?"

"হুঁঃ! এ তোকে আর করতে হয় না,—তোর মা এসে নিজে হাতে করে দিয়ে গেছে! খেয়েই দেখ না কেন? তোর দ্বারা, উনি চলে যাবার পর একটি দিনও কি ঠিক এমনটি হয়েছিল?—তবে হ্যাঁ,—নিজের কোলে যদি ঝোল টানো, সে অবশ্য আলাদা কথা!"

সুনীতি এই অবমাননাজনক বিদ্রূপে আজ একটুও আহত হইল না, যেন সে গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু একটুখানি আলোর সন্ধানই পাইল, সাগ্রহ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ বাবা! এ মায়েরই হাতের করণ! আর শোন, একটা কথা বলি, তুমি হয়ত বিশ্বাস না-ও করতে পারো, যখন আমি হালুয়া করবার জন্যে ষ্টোভে কড়া চাপালুম না, অমনি লক্ষ্মীবিলাস তেলের গন্ধ পেলুম, তুমি তো জানো, মা ও ছাড়া কক্ষনো অন্য কোন তেলই মাখতেন না।"

চন্দ্রকুমার হা হা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন,—"মনে আবার নেই, খুব আছে। তোর মা-টি কি কম দুষ্টু ছিল! ওর যত সব পুরোণ-চালের জিনিষের পছন্দ! গোলাপ জল, কেওড়া, আতর, কর্পূর, জর্দ্দা খেতেন, সেও মৃগনাভী আর কেশর দেওয়া। বিলিতী এসেন্স নিজে তো মাখতেনই না, আমি কখন মেখে এলে নাকে কাপড় গুঁজে বলতেন, 'এ মাঃ! ঘরের মধ্যে সাতটা ছুঁচো চরে গেল কখন!' সোজা দুষ্টু ও!"

শেষের মন্তব্যটুকু হাসির পরিবর্ত্তে কান্নার মতই শুনাইল। আঃ ভগবান! এত ভালবাসার বস্তুকে এমন করিয়া কেনই বা তুমি কাড়িয়া লও? একটুও কি কষ্ট হয় না তোমার একাজ করতে? অথচ 'ভাগ্যিমানের বউ মরে' বলিয়া একটা প্রবাদ কথাও তো এই বাংলা দেশেই বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে!

সুনীতি চন্দ্রকুমারের ধুতি পাঞ্জাবী আনিয়া তাঁকে পরাইয়া দিল, ঘরকন্না যতদূর সম্ভব গোছগাছ করিয়া রাখিল, ফুল আর

আজকাল তার টবের গাছগুলিতে ফোটে না, কতকগুলা যত্নের অভাবে মরিয়াই গিয়াছে। ঝিকে দিয়া মালা ও ফুল বাজার হইতে কিনিয়া আনাইল, তাহা দিয়া ফুলদানী সাজাইল, কিন্তু ফুলের তোড়ার জোগাড় করিতে পারিল না, তখন মায়ের হাতের তৈরী-করা পশমের ফুলগাছটি চিত্রিত একটি মাটির ছোট্ট টব হইতে তুলিয়া তাহা দিয়াই টেবিলের উপরিভাগ সাজাইয়া রাখিল।

প্রসন্নচিত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে সহসা চন্দ্রকুমারের মেয়ের দিকে চোখ পড়িতেই চট্‌কা-ভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া পরুষকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন ঃ

"এর মানে ? বলি, হ্যাঁগো ! এর মানে ? ওঁর চোখে আমায় খাটো করে দেওয়া, এই তো ? এমন না হলে আর বিদুষী কন্যা ! বেইমান ! বেইমান ! যার খাবে তারই কুচ্ছো গাইবে।"

ভয়ে সুনীতি শুকাইয়া উঠিল, এত পরিশ্রমে এত যত্নে সে সারা দিনে যে সমস্ত আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, হয়ত বা এখনই এক বিরাট লঙ্কাকাণ্ডে সে সমস্তই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। শুষ্ক মুখে বিপন্নভাবে নীরবে তাকাইয়া রহিল, মনের প্রশ্ন মুখে ফুটাইতে ভরসা করিল না। কি বলিতে কি হইবে—কোন ঠিকানা আছে কি তার ! চন্দ্রকুমার একটু পরেই ঈষৎ স্বর নরম করিয়া আপনা-আপনিই বলিলেন ঃ

"এ রকম মূর্ত্তি কেন ? বলবে কখন সাজ-সজ্জা করবো ? এই তো ?—তোমার মা বলতেন, 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না ?' শোননি কখন সে কথাটা ? ভূদেববাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ পড়েই দেখ না, কি বলেছেন বাংলার সেই মহান্ শিক্ষাগুরু ? বলেননি কি, 'একসঙ্গে যিনি বিবি ও বাঁদী হতে পারেন, লক্ষ্মী-চরিত্র তিনিই আয়ত্ত করেছেন।' যাও যাও, ভাল করে চুল টুল বেঁধে, ভাল দেখে জামা

কাপড় পরে এসো গো। শীগ্‌গির যাও, খুব শীগ্‌গির ফিরে এসো। কিন্তু, ওই নিয়ে সাতজন্ম লেগে থেকো না বুঝলে ?"

সুনীতির এতক্ষণে মনে পড়িল, সত্য সত্যই সে নিজের কথা সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়াছিল, সারাদিন ধরিয়া ঘর-দোরের ঝুল-ঝাড়া হইতে রাঁধাবাড়া পর্য্যন্ত করিয়া যে মূর্ত্তি তার এখন হইয়াছে, এই বেশভূষার সঙ্গে ঐ টোকা' মাথা ও ঝুলকালি মাখা হাত-মুখ যে কোন লোকের সাক্ষাতেই বাহির করার মতন নয়! চট্ করিয়া তার মনে পড়িয়া গেল, সকাল বেলার সেই শুভ-সন্দেশবাহী সুশ্রী চেহারার যুবকটিকে। তার সাক্ষাতে সকালে যা হইয়াছে সেই তো যথেষ্ট, এ মূর্ত্তি লইয়া আবারও সে বাহির হইতে চাহে না। জীবনের বিষম ঘূর্ণীপাকে পাক খাইতে খাইতে যদিও তার জীবনের মধ্যে একমাত্র বজ্র-বিদ্যুৎ-ভরা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ পথ ছিল না, কিন্তু কালের ধর্ম্ম তো আর কোনই বাধা মানে না,—পথ না পাইলেও সে যে অবসরের প্রতীক্ষায় পথপ্রান্তে অপেক্ষা করিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে। সহৃদয় সেই তরুণকে তরুণী হইয়া অন্ততঃ নির্ল্লিপ্ততার দ্বারা অবমাননা সে কোনমতেই তো করিতে পারে না।

যখন সে সাজসজ্জা করিয়া ঘরে ঢুকিল, চন্দ্রকুমার একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া সপ্রশংস বিস্ময়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া এইটুকু মাত্র বলিলেন—

"নাঃ, তোমার চেহারা যতটা খারাপ হয়ে গেছে মনে করি, ততটা হয়নি। অবশ্য সুকুমারী ঠিকই ধরে ফেলবে!"

পাঁচ

সন্ধ্যার অল্প পরেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া দুটি লোক ঘরে আসিয়া ঢুকিল, দ্বারের কপাট তাদের জন্যে খোলাই ছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতা-পুত্রী উভয়েই প্রতীক্ষ্যমান হইয়া সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে পুনঃ পুনঃ দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার কাঁটার দিকে চাহিতেছিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ততোক্ষণে ভয়ে সুনীতির বুক টিপটিপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যদি তারা না আসে, তখন কি যে হইবে, সে কথা ভাবিতেও তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

যারা দুজন ঘরে ঢুকিল, তাদের মধ্যের একজন সেই সকাল বেলার ছেলোটি,—আর একজন? সুনীতি সবিস্ময়ে দেখিল, মাথায় মস্তবড় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখে ছাইমাখা ঈষৎ পীতাভ শ্মশ্রু সংযুক্ত এক গেরুয়া আলখাল্লা-পরা সাধু।

সাধুদের তো একে বয়স বুঝাই যায় না—তার উপর মুখে ভস্ম-মাখা, মাথার উপর চূড়াকারে বাঁধা কপিসবর্ণের সেই প্রকাণ্ড জটার ছায়ায় মুখটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। চন্দ্রকুমার ভক্তিভরে প্রণত হইতে যাইতেই সাধুজী ত্রস্তে বেশ খানিকটা পিছু হটিয়া গিয়া দুই কর সংযুক্ত করিলেন, গম্ভীর নিঃস্বনে উচ্চারণ করিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!" তাঁর সাথী সসম্ভ্রমে চন্দ্রকুমারকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, "ওঁরা যে সর্ব্বভূতে নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখেন কি না,—প্রণাম তো কারু কাছেই ওঁরা নেন না, জ্যেঠামশাই! শুধু বলবেন, "নমো নারায়ণায়ঃ।" চন্দ্রকুমার প্রীত হইয়া ঐ কথাই বারে বারে উচ্চারণ করিলেন।

পূজার ঘরে আসিয়া চক্রে বসা হইলে, সাধুর হাত দিয়া লেখা বাহির হইল,—"কি, ব্যাপার কি! এমন করে রাষ্ট্র-বিপ্লব করছো

কেন? আমার সাধের পাতা সংসারটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড ছন্ন-ছাড়া করে ছাড়বে নাকি ভেবেছ?”

চন্দ্রকুমার ঈষৎ আগ্রহান্বিত হইলেও বিষম অপ্রতিভভাবে একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিলেন, “তুমি কেন আমায় ভুলে মোক্ষলাভে মন দিতে গেলে, আমি তোমার কাছে যাবার জন্যে পথ চেয়ে দিন গুণছিলুম, কেন আমার সে স্বপ্ন তুমি এক আঘাতে ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিলে?”

“হুঁ, স্বপ্ন ভাঙ্গলে শিশুরাই তো হাত-পা ছুঁড়ে ককিয়ে কেঁদে ওঠে। তুমিও যে তাদেরই মধ্যে একটি,—সে কথা আমার মনে ছিল না। যা হোক খুব প্রতিশোধটাই নিলে! মোক্ষ তো চুলোয় চলে গেছে, এই একটি বছর ধরে প্রত্যেক মানুষের মনের দোরে দোরে উঁকি পেড়ে পেড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, একমাত্র চিন্তা—কার দ্বারা মহারাজের দরবারে গিয়ে হাজির হই! অবশেষে এই মহাত্মার, এই সাক্ষাৎ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করে তবেই এই দুস্তর পারাবার পার হয়ে চরিতার্থ হতে পেরেছি। এখন প্রভুর আজ্ঞা হোক দাসীকে কি করতে হবে?”

চন্দ্রকুমার আনন্দে ও অভিমানে অবরুদ্ধপ্রায় সজলকণ্ঠে কোন-মতে কহিলেন—“কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে সুকুমারি?”

চটপট উত্তর হইল, “আমি কি সখ করে মরেছি না কি যে ওই প্রশ্নই করো? আত্মহত্যা করলে বরং ওকথাটা বলতে পারতে, আমারই কি তোমাদের ছেড়ে আসবার খুবই সাধ ছিল নাকি! নিজের কর্ম্মফলে যার ভাগ্যে যা লেখা আছে, কার সাধ্য তাকে রদ করে? কিন্তু এও বলি, তাই বলে এতটাও আবার ভাল নয়! একদিন তো আবার তোমার আমার মিলন হবেই, অনর্থক ওসব কাণ্ড করে এইটি করছো যে, এর ফলে চকা-চকীর মতন চিরকাল

ধরে দুজনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার দুদিকে থেকে যাব, কিছুতেই মিলতে পারবো না।”

চন্দ্রকুমার হা হা করিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। এদিকে তাঁকে আত্মস্থ হইবার অবসর প্রদান করিয়া কাগজের পেনসিল চালনা বন্ধ হইয়া রহিল।

তিনি কোঁচার খুঁট তুলিয়া যেই চোখ মুছিলেন, অমনি আবার লেখা হইল—“ছিঃ, কেঁদো না, আমার ওতে বড্ড কষ্ট হচ্চে! আমি আর এখানে থাকতেই পারছি না, যাই।”

ব্যগ্র ব্যাকুলতার সঙ্গে চন্দ্রকুমার আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—“সুকু! না না, এই দেখ আমি শান্ত হচ্চি, আমায় তুমি এক্ষুণি ছেড়ে যেও না।”

সুকুমারী লিখিলেন, “আমি আবার যাই কোন্ চুলোয়? যাবার কি তুমি আমার কোন উপায় রেখেছ? —যখন থেকে তোমায় ভূতে পেয়েছে, রাতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো ঘুরছি। জানো না তো, মেয়েটাও সাতটা জন-মজুরের খাটুনি খেটে খেটে প্রাণে না মরে, সেদিকেও তো অনেকটা আমায় শক্তি দিতে হচ্ছে। দেখতে দেখতে কত কাহিলই যে আমি হয়ে গেছি। তুমি না পাও, এই স্বামীজী তো আমায় দেখতে পাচ্ছেন, উনিই বলুন না।”

স্বামীজী নীরবে ঈষৎ সম্মতিসূচক মাথা ঝুঁকাইলেন।

চন্দ্রকুমারের বহুক্ষণ বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে ক্ষীণস্বরে কহিলেন, “আমায় তুমি ক্ষমা করো।” তারপর সহসা আরও গাঢ়-কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, “আমি আবার মানুষ হবো, শুধু তুমি আমায় মধ্যে মধ্যে এসে দেখা দিও, কথা কয়ো, আমায় ত্যাগ করো না।”

“তা' তো করবো, কিন্তু করবো কি করে?”

এমনি করে?”

"তাই বা কি করে হবে, বল? স্বামীজী তো আর আমার হুকুমের চাকর ন'ন, তিনি তোমার জন্যে অত ত্যাগ স্বীকার করবেনই বা কেন? জগতে তুমি নিজের মেয়ের জন্যে পর্য্যন্ত এতটুকু দয়া-মায়া করোনি, খালি দুঃখই দিয়েছ, আর অন্য লোকে তোমায় মাথায় তুলে নাচবে?"

সুনীতি এই সকল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ অভিভূত হইয়া গিয়া হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া অদৃশ্য হস্তের লেখার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া ছিল, এই কথায় ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, যদি বাবা এই কঠিন অনুযোগ শুনিয়া ফের ক্ষেপিয়া যান! মনে মনে সে মিনতি করিয়া কহিতে লাগিল, "না মা, ওমা! আমার জন্যে বাবাকে তুমি কিছু বলো না মা! ওঁর যে মাথা খারাপ, আগে কত তো ভালই বেসেছেন, দেখেছ ত' সবই? এই রকম কি ছিলেন? কি করবেন, আমারই কপাল।"

চন্দ্রকুমার একটুও কিন্তু চটিলেন না এবং আরও বেশী নরম শান্ত স্বরেই কহিলেন, "আজ থেকে আমি কারুকে কোন দুঃখ আর দেবো না, তুমি যে আজ আমার সকল দুঃখ মিটিয়ে দিয়েছ সুকু! এইবার বলো কি করলে আমি মাঝে মাঝে তোমায় কাছে পাবো?"

"এর একটিমাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি,—আর কিছুই তো কোন দিকে খুঁজে পাচ্ছি না; কিন্তু—"

"বলো, বলো, তুমি যা' বলবে আমি তাই করবো, হ্যাঁ করতে বলবে, যা' করতে বলবে,—এই তোমার দিব্বি করে বলছি"—চন্দ্রকুমার পেনসিল ছুঁইয়া আগ্রহে হাঁপাইতে লাগিলেন। সুকুমারী বলিলেন,—"দেখ, হঠাৎ কিছু না ভেবে-চিন্তেই একটা পাকা কথা দেওয়া সঙ্গত নয়, এসব তো ঠিক তোমাদের পৃথিবীর ব্যাপার নয়, মিথ্যে বলা, ধোঁকা দেওয়া এসব এখানে বাতিল।"

"কি বলবে বলতো সুকু! তুমি কি আমায় যা' তা কথাই বলবে? সে কি আমি জানি না? ভুলে গেছি তোমার চরিত্র?"

চন্দ্রকুমারের বহুদিন হাস্যাভাষ-বিস্মৃত ওষ্ঠাধারে গভীর নির্ভর-প্রেমের স্নিগ্ধ-হাস্যরেখা বিভাষিত হইয়া উঠিল।

"এই ডক্টর প্রফুল্লকান্তি গাঙ্গুলীর সঙ্গে সুনীতির বিয়ে দিলে তাঁর দীক্ষাগুরু হিসাবে স্বামীজি অপ্রকাশানন্দ তোমার আমার মধ্যে মাসে একটি দিন করে এমনি একটি মিলন-সেতু রচনা করতে নীতির অনুরোধে হয়ত সম্মত হলেও হতে পারেন, এই কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। এই আর কি!"

সুনীতির বুকের মধ্যে দড়াম্ করিয়া ধাক্কা দিয়া একটা যেন অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ডক্টর প্রফুল্ল গাঙ্গুলী পুনা মেন্‌টাল হসপিটালের জার্ম্মাণী পাশ-করা বড় ডাক্তার। প্রফুল্ল গাঙ্গুলী তার সহপাঠিনী একমাত্র অন্তরঙ্গ-প্রিয়সখী স্বাহা, যাকে সে তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা জানাইতে কোনদিন দ্বিধামাত্র বোধ করে নাই এবং সে তাদের পারিবারিক সমস্ত কথাগুলোই এবং সাইকীক্-রিসার্চ্চ-সোসাইটির লিখিত পত্রাবলী সমুদয়ই খুঁটিয়া খুঁটিয়া শুধু জানাই নয়, স্বচক্ষে পড়িয়াও দেখিয়াছে,—তাহারই সহোদর ভাই এই ডক্টর গাঙ্গুলী,—তবে কি, তবে কি—

সাগ্রহে চন্দ্রকুমার প্রশ্ন করিলেন, "তাঁকে কোথায় পাবো রে সুকু?" সুকুমারী সম্ভবতঃ যথেষ্ট উপহাসের হাসিই তাঁদের অলক্ষ্যে হাসিয়া থাকিবেন, তবে সে হাসি দর্শন করিবার মত পুণ্যবল তো পিতা-পুত্রীর ছিল না, তাই সেটা হয়ত একা স্বামীজীই উপভোগ করিলেন।

"ইনিই তো সেই ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি স্বামীজীকে আজ এখানে নিয়ে এসেছেন। নৈলে আর আনলে কে? মস্তবড় ডাক্তার

উনি, আবার মস্ত দার্শনিক, নৈলে কি আর স্বামীজী এতটা কৃপা করেন !"

চন্দ্রকুমার গদগদ দৃষ্টিতে ডাক্তারকে সসম্ভ্রমে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, সুকুমারী লিখিলেন, "কি গো ! কি মতলব ? অমত নেই তো তোমার ?"

হঠাৎ ডাক্তারকে তুহাতে বুকের কাছে সজোরে টানিয়া আনিয়া গভীর আনন্দের শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রকুমার হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "একটুও না—এক্কেবারে না, ওরে সুকু ! এই আমি তোমায় পাকা কথাই দিয়ে দিলুম, এখন তুমি নিজে থেকে যা' যা' করবার সবখানি করিয়ে নিও, আর মাসে একটিবার মাত্র, আচ্ছা তাই সই, আমায় দেখা দিও। কেমন না ?"

তারা ছিল দুটি বোন, সুজাতা ও সুদর্শনা। আনন্দনাথের পিঠা-পিঠি দুটি মেয়ে। বয়সে দুজন অবশ্য যমজ নয়, চেহারাতে এবং স্বভাবেও দুজনকার মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ, অথচ দুই বোনে বাহিরে প্রভেদ যাই থাক, অন্তরে তারা এক আত্মা, এক প্রাণ। 'দুই শরীরে একই মন'—একেই বলা হয়। বড় বোন সুজাতা শান্ত স্নিগ্ধ কোমল প্রকৃতি, চেহারাতেও তার সেই অন্তররূপের অভাব সুপরিস্ফুট। এমন মিষ্ট মধুর হাস্যমুখী মেয়ের কদাচিৎ দেখা মেলে। জলধৌত চিক্কণ নব-পত্রিকার মত বর্ণশ্রী, চোখে বুদ্ধিমত্তার ও উজ্জ্বলতার সঙ্গে লজ্জাকুণ্ঠার মৃদুভাব, স্বল্পভাষিণী অথচ বাক্যবিন্যাসে সুনিপুণা, যে কেহ এর সংস্পর্শে আসে একে মায়া না করিয়া পারে না। পড়াশোনা সযত্নেই করে, কত অল্প বয়সে বাংলা, সংস্কৃত কত ভাল রূপেই আয়ত্ত করিয়াছে,—পরীক্ষা লইলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়, অথচ তাহাকে দেখিলে কা'র সাধ্য বাহির হইতে তার বিদ্যাবত্তা বুঝিতে পারে। ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড কবিতাও সে এই বয়সে লিখিতে পারে; তবে সে-সব কবিতার এখনও একটি মাত্র পাঠিকা ব্যতীত দুটি নাই।

ছোট বোনের নাম সুদর্শনা। নামটি যতই জমকালো, মেয়েটির রূপ অবশ্য ততটা অনিন্দিত নয়, বরং প্রবীণা মহল বড়বোনের সঙ্গে তুলনা করিয়া এর রোগা লম্বা গড়নকে একটু নিন্দার চোখেই দেখিতেন। "দিন দিন মেয়ে হচ্ছেন যেন একটি তালপাতার সিপাই!"—এই রকম সব সমালোচনা মধ্যে মধ্যে উঠিয়াও পড়ে। অবশ্য মেয়ের দিদি বা তার পিতামহ—দাদুর সামনে এ কথাটা বুদ্ধিমতীরা সহজে উচ্চারণ করেন না; যেহেতু বোনের নিন্দা শুনিলে

সুজাতা তার শান্তস্বভাবের জন্য মুখে বেশি প্রতিবাদ করিতে না পারিলেও মুখখানা নীচু করিয়া থাকে, দুটি শান্ত চোখে তার জল ভরিয়া উঠে, সুবিধা থাকিলে হঠাৎ উঠিয়া সরিয়াও যায়। বেশি কড়া মনে হইলে সুদর্শনাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাকে পরম স্নেহে দুহাতে জড়াইয়া ধরে, একটা ছল করিয়া বলে, "বেঁটে মানুষ আমার দ্বারা তো হবে না, আলমারির মাথা থেকে ঐ টুলটায় চড়ে দেখতো পাখা আছে কিনা",—নয়তো বলে,—"সূর্য্যমুখী ফুলগুলি কত উঁচুতে ফুটেছে দেখ! পেড়ে আনতো, ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি।"—অর্থাৎ এইরকম করিয়া সে নিন্দাকারীকে না হোক নিজের মনকে. বুঝাইতে চাহিত 'যে যা' বলিতে হয় বলুক, আমি ওদের কথা মানিনে, লম্বা হওয়ার সংসারে কত দরকার, কত যে ওরা কাজে লাগে।"

সুদর্শনার রং তার দিদির চাইতে কিছু ফর্সা, খুঁটিয়া দেখিলে নাকে চোখেও কিছু হয়ত শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু তার বড় বড় কাল চোখের মধ্যে মাঝে মাঝে কালো মেঘের ভিতরকার বিদ্যুৎ ঝলক মারে, উন্নত নাসারন্ধ্র সঘনে স্ফুরিত হয়, কাল-বৈশাখীর ঝড়-ঝাপ্টাও কদাচিৎ উঠিয়া পড়িতে বাধে না। আগুনের একটা লকলকে শিখার মতই সে যেন দর্পিতা। এতটুকু অবহেলা বা উপহাস তার প্রাণে সয় না, অতি সহজেই সে ফাটিয়া পড়ে, বিশেষ অন্যায় দেখিলে।

অথচ এই বিপরীত-ধর্ম্মী বোন দুটির মধ্যে এতখানি মনের মিল প্রাণের সংযোগ কদাচিৎ দেখা যায়, অথবা দেখা যায় না।

সুদর্শনার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। ছোটবেলায় রুগ্ন ছিল বলিয়া বিদ্যাভ্যাসটা তার কিছু বিলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু দিদির কৃপায় নিরক্ষরা ছোট বোন দিদির অধীত বিদ্যার সারভাগ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। রামায়ণ-মহাভারতের, কামিনী রায়ের, মানকুমারীর অনেক কবিতাই

সে দিদির পড়া শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। যখন তখন বড় বড় কবিতা সে যত্র-তত্র 'রিসাইট' করিয়া বেড়াইত। সে যে পড়িতে পারে না, সহজে সেটা ধরিবার উপায় ছিল না।

দুই

সুদূর পশ্চিমের ট্রেনরাস্তা হইতে অনেকখানি ভিতরে সব্-ডিভিসন অফিসারের সুদৃশ্য বাংলোর তিন দিক বেড়িয়া খোলা মাঠ। একদিকে একটি সুরচিত ফুল-বাগান। এঁদের এখানে আসিবার পূর্ব্বে একজন কম বয়সী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী এ বাড়ীতে ছিলেন। ওদের রুচি প্রবৃত্তি একটু বেশ সৌখীনত্বের দিকে স্বতঃই থাকে, তার আমলে বাগানটি বেশ ভালরূপেই যে যত্ন সেবা লাভ করিয়াছিল তা' দেখা যায়। কেয়ারি-করা ভাল ভাল গোলাপ ফুলের গাছে অসংখ্য জাতের গোলাপ ফুটিয়া নিত্যই,—বাগানকেই শুধু নয়, বাংলো-নিবাসী এবং অদূরবর্ত্তী পথের পথিকদেরও নয়ন-মন-লোভন হইয়া থাকে। যেসব বিষয়ে ত্রুটি ছিল, বোটানির নামজাদা ছাত্র আনন্দনাথ সে সব নিরাকরণ করিয়া দিয়া তাহাকে একটি আদর্শ গোলাপ বাগিচা বানাইয়াছেন। মালির সঙ্গে সঙ্গে এদের পরিচর্য্যা তিনি স্বহস্তে করিতেন, সঙ্গী হইত তাঁর মেয়ে দুটি। এমন করিয়া নিতান্ত ছোট বেলা হইতেই বাহ্য প্রকৃতির পরিবেশে তাদের দুজনকারই অন্তঃপ্রকৃতিতেও বাপের মত সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্য উপভোগ-স্পৃহা বর্দ্ধিত হইতেছিল। যাকে বলে 'অবস্তুতান্ত্রিক' বা ভাবুকতা, রক্ত দিয়া এবং শিক্ষা সাহচর্য্য দিয়া তাহারই পত্তন এদের মধ্যে আবাল্য হইয়া গিয়াছে, তাছাড়া এটা কতকটা এদের বংশগতই বলা যায়। সোনা-দানার চাইতে এরা ফুল ভালবাসে, ফুলের মালা গাঁথা এদের মস্ত বড় ক্রীড়া-বিলাস! জাপানী মেয়েদের মধ্যে

যেমন শোনা যায় নানা সাজে তারা নিয়মিতরূপে ফুল সাজায়—ফুল পরে—এরাও তেমনি পুষ্প চয়ন, পুষ্প বিন্যাস, পুষ্পালঙ্কারে ভূষিত হইতে পারিলে কৃতার্থ হয়। সোনার মাকড়ী বালা হার দিনে দু'বার মায়ের কাছে জমা রাখিতে ছোটে, মা বিরক্ত হইলে বলে, "কি করবো, ও যে রঙ্গন ফুলের মালার সঙ্গে মিল খাচ্ছে না, কানে দেখ না কি রকম তারে গেঁথে চুনির মতন রঙ্গন-কুঁড়ির কুণ্ডল পরেছি।"

মাও তাদের অপূর্ব্ব শিল্পী, ভাবপ্রবণতায় তিনিও কারও চাইতে কম যান না, চাহিয়া দেখিয়া মুখটা একটু প্রফুল্ল করেন, কিছু না বলিলেও মুখের ভাবে স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে, "তা' বড় মিথ্যা বলিসনি, যা হোক তোদের রুচিটা তা'হলে গড়ে দিতে পেরেছি।"

সুজাতার জন্য নয়, সুদর্শনার জন্যই তাঁর মনে একটা অন্য-ভাবনা ছিল, পুত্র-সন্তান বিলম্বে আসার জন্য কোলের মেয়েটিকে অনেকদিন পর্য্যন্ত ছেলের সাজে সজ্জিত রাখিয়াছিলেন, সে সেই দাবীটা কিছুতেই ছাড়িতে রাজী হয় নাই, আকাশী নীলের রেশমী ফ্রক, গোলাপী, লাল, ধপধপে সাদা আদ্ধির সৌখীন কাটের কত বাহারের তৈরী করানো ফ্রক মেয়ে কিছুতে পরিতে রাজী হয় নাই। যেদিন তার ভাই জন্মিল, সে নিজেই উপযাচক হইয়া সেদিন কিন্তু তার দিদিকে আসিয়া বলিল, "খোকা বড় হয়ে পরবে, আর—এবার তোলা থাক, আমি মায়ের দেওয়া ঐ ঘাঘরাগুলোই পরি তাহলে, কেমন ?"

মহা খুসী হইয়া দিদি তাকে সাজাইতে বসিল, কিন্তু চুল তখনও তো ছোট করিয়াই কাটা, রিবন বাঁধা আর ঘটিল না, এই বিপত্তির সম্ভাবনাতেই দূরদর্শিনী মায়ের পূর্ব্বাহ্ণেই তৈরী-রাখা রং-মিলানো লেশদার কুঁচিদার টুপিগুলা অগত্যা কাজে লাগিল। সাজগোজ সমাধা করিয়া দিয়া হাসি-হাসি মুখে অতৃপ্ত-নেত্রে বোনটিকে নিরীক্ষণ

করিয়া যেন আশ মিটিতে ছিল না, পুলকে গদগদ হইয়া সুজাতা তার গাল টিপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোকে"—

"কই দেখি"—বলিয়া সুদর্শনা আর্সির সামনে ছুটিয়া গেল; এক লহমার দৃষ্টি বুলাইয়াই সে উগ্র তীব্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সুন্দর কই! ছাই, ছাই! দিদি! তুমি মিথ্যে কথা বল্লে কেন?"

সুজাতা কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, "তুই একটি হনুমান! পছন্দ বলে কিছু নেই তোর, যাঃ!"

দিদি আবার আজ বড় কথা বলিয়াছে, অর্থাৎ 'হনুমান' তখন সেটাকে অন্যায় আক্রমণাত্মক গালি দেওয়াই হইয়াছে, অতএব এর পর আর এ লইয়া গণ্ডগোল করা চলে না। অবশ্য না বলিলে সে এক বড় ব্যাপার হইতে পারিত।

এখন সুদর্শনার খাটো চুলে চিমটি কাটিয়া রিবন বাঁধা সুজাতার একটা বাজের মত কাজ জুটিয়াছে—প্রত্যহ বিভিন্ন রং-এর বিভিন্ন ছাঁদের। তবে টুপিটাকে বেড়াইতে বাহির হইবার সময় দু'বেলাই হাজির করিতে হয়। অবশ্য বেশীর ভাগ সুজাতাই করে, তারই গরজ, যেহেতু এটুকু চুল খুব বেশী ক্ষণ রিবনের দায়িত্ব বহন করিতে সমর্থ হয় না—পথের মধ্যেই খুলিয়া পড়ে। কত না হারাইত, যদি না পাহারা দিতে সঙ্গে থাকিত দিদি।

এহেন সুদর্শনা দেবীর যদি একটু একটু সুরুচি বোধ জন্মিতে থাকে, কলিকাতার বড়ঘরের মেয়ে মিস নিগট্ এবং পরে শ্বশুরালয়ে মিস রেক্সের ছাত্রী, ঠাকুরবাড়ীর সভ্যতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতা নবীনা জননীর মধ্যে কতকটা নিরাপত্তা বোধ কি করিয়া না জন্মিবে? দূর পশ্চিমে নাগরিক আবহাওয়ার বাহিরে বর্দ্ধিত হওয়া মেয়েটি কি শেষে একটি ধাঙ্গড় বা সং তৈরি হইবে নাকি?

কেন্দ্রস্থ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন সৌরজগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আনন্দনাথের পিতৃদেব দেশবিখ্যাত মহামনীষী পৃথ্বীদেবকেও তাঁহার পরিবারের সৌরপতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাদেবের [illegible] ধবলকান্তি, উন্নত শরীর, অপূর্ব্বদর্শন, হাস্যস্মিত প্রসন্ন মুখ[illegible] প্রবরকে দর্শন করিলে স্বতঃই দর্শকের চিত্ত শ্রদ্ধার ভারে নত হইয়া পড়িতে বাধ্য। একদা সংযুক্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ইঁহারই হস্তে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তখনকার দিনের সম্রাটতুল্য ছোট লাটদের মধ্যে কেহ কেহ এঁর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা করিতেন না, সেজন্য ইংরাজ উচ্চ রাজপুরুষ মাত্রেই এঁকে একটু বিশেষরূপ সম্মান করিয়া চলিতেন। সে-সব দিনে অনেক বড়-ঘরানা ইংরাজ এদেশে আসিতেন, বড় বড় পণ্ডিতও তখন সিবিল সার্ভিস চাকুরীতে নিতান্ত সংখ্যাল্প থাকিতেন না, তাঁরা পৃথ্বীদেবের সহিত পরিচিত হইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সুযোগ সন্ধান করিতেন, পরিচিত হইতে পারিলে সম্মানিত বোধ করিতেন। আনন্দনাথের উপরওয়ালা সাহেব যিনি যখনই আসিয়াছেন, নিজে তাঁর বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুল করেন নাই। ভিজিট রিটার্ণের সময় সুদর্শনা তার দাতুর সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। আলোর পিছনে ছায়ার মতই সে দাতুর অনুগামিনী। বড় কঠিন দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগ করিয়া প্রায় মৃত্যুদ্বার-সমাসীন হইয়াও সে বহু চিকিৎসা এবং অসম্ভব যত্ন সেবায় পুনর্জন্ম পাইয়াছে বলিয়াই হয়ত সকলের কাছেই আদরটা একটুখানি তার বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। তবে এ পরিবারের সে "আদর" দেওয়া ছিল না—যে আদরে বাড়ীর মেয়েরা "জল ঘটিটি

গড়িয়ে খায়নি" বলে আদিখ্যেতা করা যায়! এদিকে যতই আদব করা হোক না, ডিসিপ্লিন না মানিয়া স্বেচ্ছাস্বতন্ত্রতা করা এখানে চলে না, বরং বেশী কাছে থাকার জন্য ফাইফরমাস খাটা, মুখে মুখে [illegible]ী, কিংবদন্তী, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, উপপুরাণ, কথা কাহিনী [illegible] বলা শোনা ও শেখা ইত্যাদিতে শরীর ও মনকে বেশী [illegible] হয়। সুতরাং এই বয়সেই বাল্য শেষ করিয়া [illegible] সেবকদের কাছে [illegible] কান [illegible] কিছু মুখস্থ করিয়াছে। সকালে উঠিয়া [illegible] হইয়া [illegible] প্রণাম এবং ছোট ছোট নীতি-শ্লোক [illegible] তাঁহার কাছে বলিবার নিয়ম [illegible] করিয়া দিলেন। এ ব্যবস্থা উত্তরকালে এ পরিবারে স্থায়ী হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত [illegible]য়েরা একত্র হইয়া প্রত্যুষে পিতামহরূপী পিতামহকে বেড়িয়া ([illegible]তামহও বটে) দেবশিশুদের মত অথবা কোন আরণ্যক মহর্ষীব সাক্ষাতে ঋষিবালকবর্গের সামগানের মত সমস্বরে বহু স্তব-স্তোত্র পাঠান্তে স্বদেশী সঙ্গীত করিয়া দেশের মঙ্গল কামনা জানাইয়া দিবসারম্ভ করিত। সে যুগে "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে", "কতকাল পরে বল ভারত রে"—ইত্যাদি গানই চালু ছিল। এব বহু পরবর্ত্তী কালে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী মুরারি!
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে,
কর দীক্ষিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,
নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নূতনতর তান,

এস হৃদি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে,
নববেশে ভীষণ অসিধারী,
এস ভারত-পাশ-নাশকারী।"

এই অপূর্ব্ব উন্মাদনাকারী মহান সঙ্গীতের রচয়িতার পরিচয় জানা যায় নাই, তবে এখন অবশ্য এই স্বাধীন ভারতে না জানার আর কোন কারণ নাই।

পিতা-পুত্র উভয়েই বলিতেন: ডাকের মত ডাক যদি সকল ভারতবাসী মিলে ডাকতে পারে, তবে কি না এসে তিনি থাকতে পারবেন! নিশ্চয়ই ভারতের 'পাপ' নষ্ট করতে তাঁকে আসতেই হবে। তিনি নিজেই যে বলেছেন:

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং
পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

তাই তাঁকে আহ্বান-সঙ্গীত জানান এবাড়ীতে অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল, কল্কীরূপী যুগাবতারের ধ্যান প্রণাম মন্ত্রও প্রত্যহ শিশুচিত্ত হইতে পূজাভাবে উচ্চারিত হইত:

'সজল জলদ দেহ বাত বেগৈকবাহো,
করধৃত করবাল, সর্ব্বলোকৈকপালঃ
কলিকুল বনহন্তা সত্যধর্ম্ম প্রণেতা,
কলয়তি কুশলং বঃ কল্কীরূপংস্বভুপঃ।'

দুই পুরুষ ধরিয়া পৃথ্বীদেরই যে বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী মন্ত্রের বীজ বপন করেন, এ কথা আজ চাপা পড়িতে বসিয়াছে। 'প্রোপাগাণ্ডার' অভাবে হিন্দু সমাজ এখন ঘোর তামসিক আলস্যের

সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতিতে তবু কতকটা রজোগুণের আধিক্য আছে, নিজ সমাজের লোককে তাঁরা বিশ্বে সম্মানিত করিতে চান, হিন্দু সমাজের একটি আত্ম-প্রতারণাত্মক শব্দ আছে, "ধৃষ্টতায় উপেক্ষা," ব্যস্! কিন্তু এ ধৃষ্টতা কাহাদের? সত্যকে ইচ্ছা করিয়া যারা অপ্রকাশ রাখে তাদের নয়?

সাহিত্যে, সমাজে, স্বাদেশিকতার প্রথম পরিকল্পনায় বাংলাদেশ পৃথ্বীদেবের নিকটে অপূরণীয় ঋণে আবদ্ধ, ভবিষ্যতের ইতিহাসকার যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হ'ন তবে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেনই, যতদিন কোন সত্য-দ্রষ্টা প্রকৃত ঐতিহাসিকের উদ্ভব না হইতেছে ততদিন এ সত্য অবশ্য গোপনই থাকিবে।

সুদর্শনারা যেদিনে সদ্য-চিত্রিতা ভারত মাতার মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিত, তখন "বন্দে মাতরম" জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন তার পূর্ব্বরূপ পৃথ্বীদেবের রচিত সংস্কৃত শ্লোকের মূর্ত্তিতে প্রকট ছিল, সে এই :—

"মাতর্নমামি সততং সতীদেহরূপাং,
মাতর্নমামি বসুধাতল পুণ্যতীর্থাং,
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতা সমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌর কিরিটিভূষাং।

চাব

জীবনের সবচেয়ে মধুর মধুরতর মধুরতম সুখস্বপ্ন অকস্মাৎ ভঙ্গ হইয়া গেল। অসুস্থ হইয়া পৃথ্বীদেব এই সব্-ডিভিসনের পুত্রাবাস ছাড়িয়া তাঁর বেনারসের দুর্গাকুণ্ড রোডের বাগানবাটীতে সহসাই চলিয়া গেলেন। সঙ্গে তাঁর দুজন চিরসেবক মাত্র গেল। আনন্দ-নাথের ছুটি নাই, পাওয়াও সম্ভব নয়, তাঁর পত্নী ধরিত্রী দেবীর

একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর পিতৃপ্রতিম শ্বশুর তাঁকে এবার সঙ্গে লইয়া গেলেন না, ছেলেটি এখনও নিতান্তই শিশু। সুদর্শনাদের পিসিমারা ইতিমধ্যেই সেখানে আসিয়া পেঁাছিয়াছেন।

আলো • সরিয়া গিয়াছে,—যদিও দূরে থাকিয়াও রশ্মি সংহত করে নাই ; তথাপি তাহা মৃদু ও ক্ষীণ, ছায়া টিকিবে কি লইয়া ?

সুজাতা ও সুদর্শনার জীবনযাত্রার ধরাবাঁধা পথ এক নিয়মে চলিতে থাকিলে কি হইবে, সূর্য্যাস্তের সমস্ত রশ্মিচ্ছটা হারাইয়া পৃথিবীর যে দশা হয়, তাদের ঠিক তেমনিই ধারা বিষাদ বিষণ্ণ করিয়া দিল। তথাপি মনের মধ্যে ঔৎসুক্যভরা আগ্রহের সীমা নাই, এবার দুর্গাপূজার ছুটিতে বহুদিন পরে দেশে যাওয়া হইবে। আঃ! কতকালই যে তারা বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে, সুজাতা সেখানে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শোনায়, কত অপরিচিত অপরিচিতা, পরমাত্মীয় ও পরমাত্মীয়াদের গল্প করে, তাদের কথা সুদর্শনা কিছুই মনে করিতে পারে না। একটা আবছা গোছের ভাসা-ভাসা দু'চারটি কথাই স্মরণপথে মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে মাত্র।

দাদু কাশী যাওয়ার আগেই কার্য্যব্যপদেশে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাওয়া হইয়াছিল। হাঁটাপথে পাল্কী করিয়া যাওয়া হইল, দুইটি ছোট ছোট নদীতে বোটের উপর পাল্কী তুলিয়া পার করা হইল, সেও বেশ একটা বিচিত্র ব্যাপার। কিন্তু তার চাইতে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল যখন বিশালকায় (সেকালের) শোন নদের উপরকার পণ্টুন ব্রীজের উপর দিয়া তাদের পাল্কী চলিতেছিল। সেদিনের বর্ষার শোন নদ—সে এক ভীষণ ভৈরব মূর্ত্তি। তার গর্জ্জন প্রায় সমুদ্র গর্জ্জনেরই একটি পকেট সংস্করণ, তরঙ্গভঙ্গ উত্তাল। সেদিন অপরাহ্নে বাতাসটা একটু জোরেও হয়ত বহিতেছিল, ওরা দুই বোনে পাল্কীতে বসিয়া স্থির করিল, ঝড় উঠিয়াছে। পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া

দুজনে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল, মনে মনে একটুখানি হয়ত ভয়-ভয়ও হইয়া থাকিবে। দাদু তাঁর পাল্কী এদের পাশে থামাইয়া ডাকিলেন, "সুজু-সুনা! একি, দোর বন্ধ করে কি করছো? এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখছো না।" সত্য! অদৃষ্টপূর্ব্ব এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে ভরা সেই অপরাহ্ন প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য রূপ! এই জন্যই পথ-প্রদর্শক গুরুর প্রয়োজন—মানুষের জীবনপথের পদে-পদেই প্রয়োজন।

বর্ষার রজনীগন্ধা এবং বহুবর্ণের জিনিয়া ফুলের বিচিত্র শোভা-সম্ভারে সারাক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। সুজাতা বড় কর্ত্তব্যপরায়ণা শান্ত মেয়ে, ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া রাখে, কিন্তু সুদর্শনাকে বাগানছাড়া করাও কঠিন! একেবারে সে ফুল-পাগলা। খেলার পুতুলের চাইতে ফুলের পুতুল বানাইয়া সে কত বিচিত্র খেলারই না অবতারণা করিতে পারে! অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ, রামের হরধনুভঙ্গ, এমন কি রাজসূয় যজ্ঞ অবধি ঘটাইয়া বসে। ফুলের তো আর অভাব নাই, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার পুতুলের মতন তো আর নয়। যত খুসী লোক তৈরি করা যায়।

পাঁচ

শরৎকালের প্রখর সূর্য্য করোজ্জ্বল সুপরিচ্ছন্ন প্রভাত। রেল-পথের দুধারে খালবিল হ্রদ তড়াগ খানা ডোবা পুষ্করিণী সমস্তই বর্ষাজলে পরিপূর্ণ হইয়া টলমল টলমল করিতেছে। যেখানে সেখানে জলজ পদ্ম শালুক হেলা ফুলের শ্বেত ও আরক্ত বর্ণ শোভায় জলময় উদ্যানগুলি আলোকিত হইয়া ঝলমল ঝলমল করিতেছিল। কোথাও হেলেঞ্চা শুশুনি কলমীদামে, কোথাও পানিফলের লতায় লতায় অথৈ জল দেখা যায় না, কোথাও নির্ম্মল জলে মৎস্যকুল নির্ভীক আনন্দে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। ছোট ছোট ছেলে-

মেয়েরা ধানক্ষেত উলটিয়া চুনাপুঁটি প্রভৃতি চারা মাছ সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিল। জেলেরা জাল ঘুরাইয়া জলে ফেলিতেছে অথবা জাল গুটাইয়া ধৃত মৎস্য ডাঙ্গায় আনিতেছে, নদীর চরে চরে শ্বেত চামরের মত কাশফুলের কি বিচিত্র শোভা! বিপদ এই যে এ-দিকে চাহিতে গেলে ও দিকটায় দেখা যায় না। পাহাড় পর্ব্বত, নদ-নদী, ছোট গ্রাম, কত না' কি! আবার টেলিগ্রামের তারে বসিয়া দোল-খাওয়া নীলকণ্ঠ, বুলবুলি, বাবুই, কাঠঠোকরা পাখীরা! তারাই কি কিছু কম দর্শনীয়? মাছরাঙ্গা, বক জলের উপর একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সুদর্শনা এদের এর আগে কখনও দেখে নাই, সুজাতা দেখিয়াছে বিতোগ্রামে—তার বেশ মনে ছিল, সে-ই এসব চিনাইয়া দিয়া তার বোনের গুরুগিরি করিতেছে।

"দিদি! দিদি! দেখ, দেখ, কতবড় একটা শঙ্খচিল! আচ্ছা ওটা অমন দেখতে কেন? কিরকম যেন।" সুজাতা হাসিয়া বোনের গাল টিপিয়া দিল, "যাঃ, ও চিল কেন হতে যাবে, ওতো শকুনী! ঐ দেখ্ কত উড়ছে, ওদিকটায় হয়ত ভাগাড় আছে।"

"সত্যি? আচ্ছা দিদি! নতুন ঝি যে বলতো, 'গো-ভাগাড়ে গরু পড়ে,—শকুনির মাথায় টনক নড়ে,' কেন আমায় ওরকম বলতো তাহলে? ভারী দুষ্টুতো? আচ্ছা ওকে দেখাবো মজা।"

"তুই যে গল্প শোনবার জন্যে ওর কাজ হওয়া মাত্তর ওর সন্ধানে সন্ধানে থেকে ডাকাডাকি করতিস্, তাই ওকথা বলতো।"

"ইস্! তাই জন্যে ওইরকম বিশ্রী একটা জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করবে? দাঁড়াওনা মজা দেখাচ্ছি বাড়ী গিয়ে।"

"ঐ দেখ, ওকে বলে জলপিপি, ঐ যে জলে সাঁতার কাটছে।"

"বাঃ, বাঃ, কি চমৎকার সাঁতার কাটে, হাঁসদের মতন, না?"

নিজেদের বাড়ীতে ঢুকিয়া সুদর্শনা বিস্ময়ে মূর্চ্ছা যাইবার

জোগাড়! কি চমৎকার প্রকাণ্ড প্রাক্ শোন-নদ ধরণের মস্তবড় নদী! আর কত রকমারি ফুল! প্রকাণ্ড বাগানে অসংখ্য জাতীয় গোলাপ ফুটিয়া যেন দিক সমূহ আলোকিত করিয়া আছে। তার সঙ্গে কত নাম-না-জানা, না-দেখা দেশী-বিদেশী ফুলের কেয়ারি লতার অসংখ্য কুঞ্জ বানানো। দেওয়ালের গায়ে গায়ে এবং থামে থামে স্থানে স্থানে বহু জাতীয় আইভি-খচিত। প্রকাণ্ড দৌড়বার লম্বা বারান্দাটায় বড় বড় বাহারে টবে মনসা জাতের বহুল বৈচিত্র্য অর্কিডের ঝুলন্ত খাঁচা। নাই এমন কিছুই নাই! আনন্দনাথই এ-সবের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁর 'বোটানি পড়ার' এগুলি লব্ধফল, লাইব্রেরীতে ঐরকমই অসংখ্য ইতিহাস সংগ্রহ, নানা দেশের বিচিত্র-বিচিত্র শিলা-জাত, হাতির দাঁত, হরিণের, গণ্ডারের, বাঘের ষ্টাফ্ করা মুণ্ড; পাখী—মৃত ও জীবিত দুইয়েরই বিচিত্র সংগ্রহ আছে। এছাড়া তরুলতায় ও ঝুমকা লতায় জড়ানো লোহার রেলিং-ঘেরা কৃত্রিম কানন-গৃহে মৃগযূথ ইচ্ছাসুখে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। ময়ূর দুইটি অপরাহ্ণে মেঘময় আকাশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কি নাচটাই না নাচিল! কি বিচিত্র ইন্দ্রধনুর মত বর্ণোজ্জ্বল, ছটা-বিস্তারিত ওদের পেখম!

অথচ দুচার দিনেই নূতনত্বের এই বিস্ময়-বিজড়িত নেশার ঘোর যখন কাটিয়া গেল, তখনই সে দেখিল, অনুভব করিল, এই তাদের নিজস্ব ঐশ্বর্য্যময় স্বর্ণপুরীতে সে আর সে সুদর্শনা নয়, পাঁচজন বা পঁচিশ জনের মধ্যে একজনমাত্র। সব্-ডিভিসনের হাকিম-দুহিতা নয়, যে-পথে বাহির হইলেই দুধারী সসম্ভ্রম সেলাম পড়ে, বরং বাসন-মাজা ঝিটা পর্য্যন্ত সুবিধা পাইলে খ্যাঁক করিয়া উঠে। তাছাড়া যে কেহই যে কোন কারণেই খ্যাঁক করিতে তৈরি থাকে, ও বলিয়া নয়, এখানের এই দস্তুর,—এর জন্য সবাই প্রস্তুত আছে।

সব চেয়ে বড় কথা, যারা তার জীবনের কেন্দ্র দাদু আর দিদি, তাদের সে এই লোকারণ্যের মধ্যে হারাইতে বসিল। ওখানকার মত দাদুকে তেমন করিয়া তো আর একান্ত ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কত কাজ, কত অসংখ্য লোকজন আসে যায়, মাঝে মাঝে লাট-বেলাটের দরবার ইত্যাদিতে বাড়ী ছাড়িয়া যান, ওখানকার মত সুদর্শনা আর তাঁর সহযাত্রিনী হইতে পায় না, সে এখন দশের মধ্যে একজন মাত্র। অভিমানে মন ভরিয়া উঠে। তবে নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতিতে দাদুর সঙ্গ এখানেও নিয়ম-নিয়ন্ত্রিতা, এর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। সম্মিলিত শিশুবাহিনীর শীঘ্রই সে তার প্রায় সমবয়স্ক পিতৃব্য পুত্রের সহিত একত্রে পরিচালক পদস্থ হইয়া উঠিল।

দুঃখ এবং ফলে ক্রোধ উপজাত হইল তার সবচেয়ে বেশী সুজাতার উপরে। সে এখানে আসিয়া অন্য দলে ভিড়িয়া গেল এবং তার সঙ্গে নেহাৎ দিদিগিরি ফলাইতে লাগিল, সে আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়, বন্ধু হইল মেজদি, সেজদি ইত্যাদিরা। খুব হাসা-হাসি চলিতেছে, সে আসিলে সব চুপ! সেও ভিখারী নয়, যাচ্ঞা করিয়া লইবে না, থাকুক ওদের সঙ্গে, নাই ওকে দলে লইল, সেও একটা দল গড়িবে, তবে কথা এই, দিদির অভাব কি পূরণ হইবার?

ছয়

বাড়ীতে উপর্য্যুপরি তিনটি বিবাহ হইয়া গেল। পূর্ণ দুইটি বৎসরও নয়, এরই ভিতরে তিনটি নূতন লোক আসিল একান্ত আপনজন হইয়া। নৃপেন্দ্র, সুকুমার ও সুজিত; এদের মধ্যে সুকুমার ও সুজিতকে পাইয়া সকলেই তৃপ্ত, সুদর্শনার তো কথাই নাই। তার ছাই-পাঁশ আগড়ম-বাগড়ম শোনার অদ্ভুত ধৈর্য্য ছিল সুজিতমোহনের। নিজেও সে যথেষ্ট বকিতে পারে। কত ভাল

ভাল ডিটেকটিভের গল্প, এমন কি অত বড় যে কাউণ্ট মণ্টিক্রষ্টোর বিরাট কাহিনী—তাও হপ্তায় হপ্তায় আসিয়া সে তাকে ও সুজাতাকে শুনাইয়াছে। উপহার সে প্রায়ই দেয়। লইতে বড় লজ্জা করে, এ লইয়া যথেষ্ট মান-অভিমানও চলিতে থাকে, অবশেষে না লইয়া ছাড়ান থাকে না, অবশ্য লোভনীয় বস্তুতে ছেলেমানুষ তারও যে কিছুমাত্র লোভ ছিল না, সে কথা কেমন করিয়া বলা যায়? তবে কিনা পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দেখিতে ওরা নিত্যই আদিষ্ট হয় কিনা, মনে বড়ই কুণ্ঠা আসে।

প্রথমে সুজিত এদের বাজে গল্পই বলিত। একদিন দিদির কাছে একটি ইংরেজী ডিটেকটিভের গল্প শুনিয়া, সুজিত আসিলে সে সঘন ঝঙ্কার তুলিল—"যান যান, কে শুনতে চায় আপনার ছাই-পাঁশ গল্প! দিদির বেলায় যত ভাল ভাল বেছে বেছে রেখে, আমার বেলায় খোকাখুকির মতন—হ্যাঁঃ, শুনছি আমি তাই।"

সুজিত মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিল, "তুমি কি খুকি নও?"

আর রক্ষা আছে! সুদর্শনা সর্পিনীর মতই ফুঁসিয়া উঠিল, "তাই না! আমি খুকি? চলুন না দাত্বর কাছে, চলুন, কি বলেন তিনি শুনবেন চলুন, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ধরেছি না? বাল্মীকি রামায়ণের পদ্যানুবাদ করছি না? আমায় খুকি বলা হচ্চে!"

দারুণ ভীতিপূর্ণ শিহরণের অভিনয় করিয়া সুজিত কহিল,—"দেবি! ক্ষম দোষ; মূর্খজনে রোষ নাহি কর। আমি কি জানিব বল মহিমা তোমার!"

"কী ভীষণ তুষ্টু আপনি!" সুদর্শনা ঘুঙুর-গাঁথা মল সঘনে বাজাইয়া সরোষে প্রস্থান করিল। অবশেষে দিদির অশ্রুতপূর্ব্ব ঐ বৃহত্তর উপন্যাসের ঘুষ কবলাইয়া মিটমাট হইল।

সাত

নিতান্ত অল্প বয়সেই সুদর্শনার বিবাহ হইয়া গেল। তার দাতুর একান্ত অনিচ্ছায় রোগাটে ও রুগ্ন এবং সংসার-অনভিজ্ঞা এই তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্রীটিকে এত শীঘ্র পরের ভাগ্যে সঁপিয়া দিতে তাঁর গভীর স্নেহ-হিতৈষণাভরা চিত্ত ভালমতে সায় না দিলেও বৎসর তিনেক শ্বশুরঘর করিতে না পাঠানোর কড়ারে ছেলেটির রূপ, গুণ ও চরিত্রের বিশেষ রূপ খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। সুজাতা এখন প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করে। আর একটি খোকা কোলে পাইয়াছে। ছেলেটিকে অবশ্য অর্দ্ধেক দখল করিয়াছে সুদর্শনাই। গভীর স্নেহে মাসিমা তাহাকে দিয়া সন্তান-স্নেহের রসাস্বাদন করিতেছিল, তা এ-যে তাদের জন্মগত অধিকার! যতই সংসার-অনাসক্ত কাব্যিক-মনই হোক, তবু তাদের এ সহজাত-ধর্ম্ম, বাহিরে যাই থাক, ভিতরে জাগ্রত আছেন যে অনাদি জননী। সমবয়সী একটি বোনের বিবাহ দেখিয়া তার একবারটির জন্য বিবাহের সাধ মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী যাওয়া দেখিয়া সখ মিটিয়া গিয়াছিল। নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া ভয়ে ভাবনায় শুষ্ক মুখে একা পাইয়া দাতুকে গিয়া বলিল, "আমায় কেন বিয়ে দেবেন দাতু? আপনি যে বলেছিলেন, ঋষিকুমারীদের মতন পৈতে দিয়ে বেদ পড়াবেন আমাকে।"

দাতু উত্তর দিলেন হাস্যমুখেই, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্বে বলিলেন, "ইচ্ছা করে, কিন্তু আমি আর কত দিনই বা বাঁচবো,—তখন তোমায় কে দেখবে? আরূঢ়-পতিত হয়ে যাবে যে। নাঃ, এ ভালই হবে। ছেলেটি খুব সৎ ও বিদ্বান, দুঃখ তুমি ওর হাতে পাবে না।"

এই তো তার বেদবাক্য! দাতু যখন 'ভাল' বলিতেছেন, নিশ্চয়ই

তার ভাল হইবে। সুধীরকে সে যদিও চোখ তুলিয়া দেখে নাই, তবে আবছা দেখায় বুঝিয়াছে চেহারাখানা তার ভাল। তবে তাকে কথা কহাইতে চায়, এই যা' বড় দোষ! সুদর্শনা মুখচোরা মোটেই নয়, বরঞ্চ মুখরাই,—কিন্তু কে জানে কেন এর কাছে আবোল-তাবোল বকিতে একটু যেন বাধবাধ ভাব হয়। তাছাড়া দরজার বাহিরে এ বাড়ীর মেয়েরা 'আড়ি পাতিতে' খুব ওস্তাদ! শ্বশুর বাড়ীর দুটিরাত্রে পড়াশোনা, শিবপূজার কথা, ভাইবোনদের পরিচয় সে দিয়াছে, শুধু শেষের রাত্রে সুধীর তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, "আমায় তোমার খারাপ লাগছে না?" সে উত্তর দিয়াছিল, "খারাপও না,—ভালও না?' এই লইয়া তার ক্ষুদে-ননদটি হাসিয়া হাসিয়া গালে একটা ঠোনা মারিল, চোক পাকাইয়া বলিল, "ইস্ 'খারাপও না, ভালও না' কেনগা? আমার অমন সুন্দর দাদা, 'ভালও না'র মানে?"

তা' হলে কথা কওয়াতো মুস্কিল! 'সরল-সত্যকথা' বলিতেই যে দাদু এ যাবৎ তাকে শিক্ষা দিয়াছেন। 'মন-রাখা', 'অর্দ্ধ সত্য' অথবা মিথ্যা বলা ত ওর অভ্যাস নাই।

বাড়ী ফিরিবার পর সুজিত যখন আসিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, "কিগো দর্শনা, বরটিকে কেমন লাগলো?"

সে সগর্ব্বে দ্বিধাশূন্যচিত্তে তৎক্ষণাৎ জবাব করিল, "ছাই"!

"ছাই?—কি ছাই? তোমার মনটা ছাই? না, আমার যে মুখ অমন অসঙ্গত প্রশ্ন করে, তা'তেই ছাই?"

"যান! বড্ড আপনি ইয়ে হয়েছেন, আপনার সঙ্গে আর একটি কথা আমি কইবো না, এই সোজা বলে দিচ্চি!"

"পুঁজি করে রাখা নেহাৎই দরকার, বাজে খরচ কেনই বা করবে, সে তো জানা কথাই। আমি কিন্তু কইবো, যতই তুমি মুখে ছাই ঢালো না কেন।"

সুদর্শনা রাগে গর গর করিয়া ঝঙ্কার ঝাড়িল, "মাগো! কি বিশ্রী মন আপনার। আমি কখন আপনাকে ওকথা বল্লুম? দিদিকে বলে দেবো,—আজকাল আমায় আপনি বড্ড জ্বালাচ্চেন। কেন, আর কি কোন কথা নেই?"

সুজিত শান্ত-গাম্ভীর্য্যের সহিত চিন্তার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল, "আর কোন কথা,—হ্যাঁ, আছেই ত, সে ভদ্রলোক আসছেন কবে? তুমি বা সেখানে কবে যাচ্চো—"

আর রক্ষা আছে! সাপের লেজে পা পড়িল! সুদর্শনা গরম তেলে-পড়া বেগুনের মত ছ্যাঁক করিয়া উঠিল, "তা' আর নয়! আমি আবার যাচ্চি ওদের বাড়ী! দাদু আমায় সেখানে যেতে দেবেন না,—যে কষ্টে দাদুকে ছেড়ে তিনটি দিন ছিলুম, সে আপনি কি করে বুঝবেন।"

সুজিত মুখ টিপিয়া হাসিল,—"আর দাদু যদি দিদিটির মতন ঠেলে পাঠিয়ে দেন?"

সাহঙ্কারে উত্তর দিল, "সব্বাই দিদি নয়গো! ও যেমন ভাল মেয়ে, আমি তো সেরকম নই; আমি যাব না, দাদুর পা'ধরে পড়ে থাকবো,—নড়বোই না।"

"দাদু যদি নড়া ধরে তুলে ব্রুহামে পুরে দোর বন্ধ করে দেন? পাহারাওলা সঙ্গেই তো থাকবে, সে তখন ম্যানেজ করে নেবে। কেউ কারু হক ছাড়ে? আমি কি ছেড়েছি?"

সুদর্শনার অভিমান কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে, কোনমতে আত্মাহঙ্কার বজায় রাখিতে চাহিয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়া দিল,—"আমি যাবো না।" চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছে এবার বুঝি পড়ে পড়ে।

সুজিত ঈষৎ অপ্রতিভ হইল, নরম সুরে কহিল, "তুমি একটি পাগল!"

"আপনি ? আপনি একটি—"

"কি ? থামলে কেন ? গৰ্দ্দভ ?"

এবার সজল চোখের মেঘে শরতের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল,- "আহা, তাই কি কখনও বলতে পারি ? আপনি হচ্চেন বড় ভগ্নিপতি, বয়সে কত বড়।"

সুজিত সজোরে হাসিয়া ফেলিল, "বলছিলে-ত, আবার বিনয় দেখাচ্ছেন।"

সুদর্শনা নিজেকে জয়ী বুঝিয়া সংহত অভিমানে বিনীত বাক্যে জানাইল, "সেই জন্যেই ত বল্লাম না। যাকগে পাঁচ-পরেদের কথা থাক, অনেকদিন আপনি একটাও গল্প বলেননি, আজ তো এখানে খেয়ে যাবেন, খাবার পর গল্পের আসর যদি না বসে তাহলে কিন্তু ভীষণ আড়ি দেবো। দাতুর কাছে অনেকক্ষণ যাইনি, আমি চল্লাম।"

বিবাহিত জীবন তাহাকে কোন ফ্যাসাদে ফেলে নাই। সেই পণ্ডিতমশাই, মাষ্টারমশাই ও দাতুর কাছে সংস্কৃত কাব্যপাঠ চলে। সুধীর দৈবাৎ নিমন্ত্রিত হইলে রাত্রিবাসের নিমন্ত্রণ সে পায় না। সাঙ্গো-পাঙ্গো সঙ্গে সুদর্শনা সাজসজ্জা করিয়া দ্বিপ্রহরে একবার দর্শন দিয়া আসে। এ একরকম মন্দ নয়! উপরন্তু শ্বশুরবাড়ীর বস্ত্রালঙ্কার, তত্ত্ব-তাবাস তা নেহাৎ মন্দ আসে না। ওদিকে তার খুব বেশী লোভ না থাকুক, তবু সে যতই হোক, ভিতর হইতে মেয়ে বই তো আর ছেলে নয়। অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে প্রকৃতি ঠাকুরাণী তাঁর ভাঙ্গা-গড়া কাজটুকু নীরবে সমাধা করিতে তো আর ছাড়েন না। এত আস্তে সে মেসিনটি চলে, বাহিরে নিঃসাড় নীরব, কেহ কিছু জানতেও পারে না।

অকস্মাৎ বসন্তের সাজানো বাগান প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সৌরপতি রাহুগ্রস্ত হইলেন। অনারোগ্য আয়ুক্ষয়কর

রোগে পৃথ্বীপতি ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারাইতে লাগিলেন। দেশ-বিদেশের সমস্ত গণ্যমান্য ডাক্তার কবিরাজ কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। সেবা যত্ন যতদূর সম্ভব তার কোনই ত্রুটি নাই। বায়ু পরিবর্ত্তন, ঘরের বজরায় গঙ্গাবক্ষে বায়ু সেবন—সবই হইল, শেষে একদিন সেই অমূল্য জীবন-প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সজ্ঞানে সানন্দে সর্ব্বকর্ম্মসমাপ্তির প্রশান্ত পরিতৃপ্তির সহিত সে যেন মহাপ্রস্থান, মৃত্যু নয়,—অমরত্বের পথে বিজয়যাত্রা! কিন্তু এখানকার আলো নিবিল।

এই যে ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল, যদিও প্রায় বর্ষাবধিই ইহার ভীষণ সম্ভাবনায় বাড়ীশুদ্ধ লোকই ভিতরে বাহিরে গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা অনুভব করিয়া আসিতেছিল, তথাপি যে মুহূর্ত্তে সেই সন্দিগ্ধ সম্ভাবনার বিষয়টা বাস্তবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, প্রত্যেকের উপর সে যেন একটা আকস্মিক আঘাতের মতই পতিত হইল। বিশেষ করিয়া সুদর্শনা—অতর্কিত আক্রমণে মানুষ যেমন দিশা হারায়, যেন সেইরকম আকুল হইয়া পড়িল। দাদু, তার চিরদিনের দাদু, যার বাড়া তার আর কিছুই বড় ছিল না, প্রিয় ছিল না, সত্য ছিল না,—সেই দাদু! অত মহৎ, অত মহান, অমন স্নেহময় সেই দাদু যে এমন করিয়া সত্য সত্যই একদিন তাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন, এতদিন ধরিয়া এতখানি দেখিয়া শুনিয়াও সে যেন ভাল করিয়া তাহা ধারণা করিয়া লইতেও পারে নাই। রোগ যতই কঠিন হোক, চিকিৎসকের যতবড় হাটই,এ বাড়ীতে বসুক, মন যে তার অটুট বিশ্বাসে দেব-দেবীদের পায়ের তলায় মাথা কুটিয়া বরাবর অভয় পাইয়া আসিয়াছে। কিছুতেই সে চিত্ত বলহারা হয় নাই। দাদুর মত এত বড় জীবন কখন কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে? এত বড় অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিশ্বাস করিবে কে?

কিন্তু যা' অসম্ভব তাও সম্ভব হইল। সুদর্শনার মনে হইল এর পর আর তার বাঁচিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজনই বাকি রহিল না। যে পৃথিবীতে তার দাদুর স্থান হয় নাই, সেখানে তারই বা স্থান হয় কেন? যে দেবতা দাদুকে তাঁর কাছে তাকে বঞ্চিত করিয়া টানিয়া লইয়াছেন, কিসের অবিচারে তিনি তাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়াছেন? কি অধিকার আছে তাঁর এত বড় পক্ষপাত করিবার? সারাদিন ভূমে লুটাইয়া ক্রমাগতই সে আত্মগত এই প্রশ্ন করিয়া বলিতে লাগিল, 'এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কি?'—এই প্রশ্নের উত্তর কেহই তাহাকে দিতে পারে নাই। কারণ কাছে তার কেহই ছিল না,—সে একাই আপনাকে,—শুধু—একমাত্র আপনাকেই এই প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছিল। উত্তর পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়ত উহ্যভাবে মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু উত্তর পাওয়ার কোন উপায়ই তো ছিল না। আর উপায় থাকিলেই বা কি?

এ প্রশ্ন এই পৃথিবীতে আজই কি নূতন করিয়া উঠিল? অনেকেই এর বহু বহু পূর্ব্বেই, এমন কি, খুব সম্ভব এ প্রশ্ন চিরদিন ধরিয়াই করিয়া আসিয়াছে। উত্তর কেহই এ পর্য্যন্ত পাইয়াছে কি? খুব সম্ভব পায় নাই। 'এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কি?' বাস্তবিকই প্রশ্নটা বড়ই কঠিন। দুঃখ, দৈন্য, দুর্ব্বিপাকে ভরা মৃত্যুময় এই সংসারে রোগের অসহ্য যন্ত্রণা, শোকের দুর্ব্বিসহ আঘাত, অভাবের অকথ্য তাড়না, সর্ব্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষেরই অমানুষিক অবিচার ও অত্যাচার,—এত সব সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া? বাঁচিয়া থাকে কেন? এ তত্ত্ব বুঝিয়া ওঠা কঠিন বই কি! অথচ দেখা যায়—সদা সর্ব্বদাই দেখা যায়, তেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকা সার্থক হোক বা অসার্থক হোক, মানুষ বাঁচিয়াই থাকে,—সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়াও বাঁচে।

মুখে মৃত্যুর কথা বলিলেও এমন কি খুব তীব্রভাবে মনে করিলেও বাঁচিয়া থাকার স্পৃহাই তাদের মধ্যে সমধিক প্রবল, অবচেতন মনের মধ্যে সে স্পৃহা যে কেমন করিয়া কোথায় লুকানো থাকে, সে খবর সে নিজেও তো আর জানিতে পারে না, তাই তো কোন অবস্থাতেই মানুষ আন্তারিকতার সঙ্গে যথার্থভাবে মৃত্যু কামনা করে না। আকস্মিক একটা ক্রোধ বা মোহের বশে,—মধ্যে মধ্যে দেখা যায় সে আত্মহত্যাও করিয়া বসে বটে, কিন্তু সে রকম ক'জনেই বা করে? আর করিলেও যারা করে তারাও প্রকৃতিস্থতার মধ্য দিয়া তাহা করিতে পারে না। সাময়িক উন্মত্ততার মধ্য দিয়াই এমন অমানুষিক কাজটা করিয়া বসে।

হ্যাঁ, বাঁচিয়া থাকাতেই মানুষের সুখ! সে যে মৃত্যুর কথা বলে বা ভাবে সে শুধু জীবনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণার বশে নয়,—বিড়ম্বিত জীবনের একান্ত অভিমানেরও ফলে নয়, এতদিন ধরিয়া যে অপ্রতিহত সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে সে সমাসীন ছিল, আজ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন অনির্দ্দেশ্য জীবনের জটিল জালে বিজড়িত হইবার একটা নিদারুণ আতঙ্ক-মিশ্র দুর্ভাবনা তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। সুদর্শনার ঠিক এই অবস্থাটাই ঘটিয়াছিল। দাদু-হীন পৃথিবী যে তার পক্ষে একান্ত নূতন, এই নূতন অবস্থাটাকে সে ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছিল, নতুবা মরণের জন্য তার মনে সত্যকার আগ্রহ জাগিয়া ওঠা সম্ভবপর মনে হয় না। এই ত তার সবেমাত্র কিশোর বয়স মাত্র, এ বয়সে অন্তর হইতে কখনও মৃত্যুর আহ্বান শোনা যায়?

সুদর্শনা তার দাদুকে যেমন করিয়া তার সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়াছিল, তেমন হয়ত আর কেহ পারে নাই। তার দিদি সুজাতাও তাঁকে দেবতার মতই ভক্তি করিত, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম

ভালবাসা অন্তরের মধ্য হইতে ঢালিয়াও দিয়াছিল, কিন্তু ধৈর্য্যশীলা ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে সে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তর্প্রবাহিনী, বাহিরে সকল অবস্থাকেই সে ধীরস্থির ও নীরব সংযমের সহিত গ্রহণ করিতে পারে। তার উপর স্বামীর প্রেমে, সন্তান-স্নেহে সে পত্নী ও জননীর কর্ত্তব্য লইয়াও কতকটা আত্মবিস্মৃতা। নিজের দুঃখ লইয়া তাহাকে একান্তভাবে লালন করিয়া বেড়াইবার অবসরই বা তার কোথায়? বরং সে এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে বাবার জন্য, পিসিমাদের জন্য, বিশেষতঃ গভীর শোকে সমাচ্ছন্ন বোনটির জন্যই আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছে। বিরাট শ্রাদ্ধ-ব্যাপারের সুবিপুলতর আয়োজনের মধ্যেও শ্রদ্ধান্বিতা পূজারিণীরূপে নীরব অশ্রুজলে অভিসিঞ্চিতা হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিতে করিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সচেষ্ট আছে।

সুদর্শনার শোক কিন্তু সহজবোধ্য নয়। সে এ পর্য্যন্ত দাদু ভিন্ন আর কোন সম্পর্কের মধ্যে খুব নিবিড়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিতে পারে নাই। এমন কি, দিদি ব্যতীত আর কোনখানেই নিজের কোনরূপ দাবীও সে এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠা করে নাই। একমাত্র দাদুকেই সে তার সমুদয় চিত্ত-প্রাণ সমর্পণ করিয়া দিয়াছিল। সেই দাদুকে ছাড়িয়াও যে সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এই অভিজ্ঞতা তাহাকে সুগভীর বিস্ময়ে এবং সুকঠোর ধিক্কারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এও কি হয়? এও কি সম্ভব? নিজেকে সে কঠিন কণ্ঠে পুনঃপুনঃই এই প্রশ্ন করিয়া নিজের প্রতি অশ্রদ্ধায় যেন বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বার বার করিয়াই বলিল, "ধিক! এই তোমার অত ভালবাসা? তুমি মরিয়া গেলে দাদু কিন্তু কখনই এমন করিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না!"

আশৈশবের শত সহস্র অবিস্মৃত স্মৃতি যেন সহস্রফণা ফণীর মতই

তাহার সমস্ত মনটাকে বিষ দন্ত দিয়া সবলে দংশন করিতে লাগিল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না, ইহার পর সে বাঁচিয়া থাকিবে কেমন করিয়া, কাহাকে লইয়া এবং কাহারই বা জন্য ?

অন্যান্য অনেকেরই মত এ ব্যাপারে নিমন্ত্রিত হইয়া সুধীরও এ বাটীতে আসিয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়াই সে দানসাগর শ্রাদ্ধের সমারোহের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়া গেল। কাজকর্ম্ম সব শেষ হইবার পর একদিন সুযোগ মিলিলে সে সুদর্শনার শোক-সংবিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহ পরিপূর্ণ সহানুভূতির সহিত কহিল,—"শুনলুম, তুমি কিছুতেই শান্ত হতে পারছো না, খাওয়া-দাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছ ; কিন্তু সকলের কথাও তো তোমার ভাবা উচিত। দাদুকে কি তুমি একলাই হারিয়েছো ? আমাদের কি কিছুই খোয়া যায়নি ?"

একান্ত দুঃখের সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি সুদর্শনা স্তব্ধ থাকিয়াই শুনিল। শুনিতে শুনিতে অকথ্য বেদনার সহিত তার মনে হইল, যে লোক তাকে এই সামান্য কয়টামাত্র দিনই দেখিতে পাইয়াছে, সে যখন এমন বিষাদিত কণ্ঠে তাঁর সম্পর্কে কথা বলিতেছে, তখন তার দুঃখ যে কত বড় তার কি কোন হিসাব করা চলে ? উঃ, এ যেন কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

তবু যেদিন দুজনকার চোখের জল একসঙ্গে মিলিত হইয়া সেই যে একই খাতের মধ্যে দুই চিত্তধারাকে একত্রে বহিয়া আসিতে সহায়তা করিল, ইহা তুচ্ছ নয়। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম তার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে এই বাৎসরিক কাল ধরিয়া এ লোকটিকে সে যতটা দূরবর্ত্তী বলিয়া জানিত, হয়ত এ তা নয়। এই দেড় বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে কখন যে কেমন করিয়া এই চির অপরিচিত পরের চেয়েও পর তার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা

জানিতেও ত কই পারা যায় নাই? আজ সবার চাইতে এই সত্যটাই তার চিত্তকে যেন ঈষৎ ভারমুক্ত করিল যে, হয়ত অল্পকালের মধ্যে এই লোকটি তার দাত্নকে সত্য করিয়াই ভালবাসিয়াছিল। হ্যাঁ, ভাল না বাসিলে তার গলার স্বরে হৃদয়ের ওই আবেগ স্পন্দন কখনই এমন সত্যের সুরে ধ্বনিত হইতে পারিত না! আলো নিবিয়া গেলে মানুষ ছায়ার পিছনে ছুটিয়া বেড়ায়। নিঃসঙ্গ সে যে থাকিতে পারে না।

কেমন করিয়া কি হইল কিছুই বোঝা গেল না, ঘটনাটা বড়ই অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল। অবশ্য ব্যাপারটা সংসারের পক্ষে একান্তই অপ্রত্যাশিত নয় এবং এ-সব ঘটনা প্রত্যহ ঘটে না, অকস্মাৎই ঘটে; তবে কি না একবারে এতটাই!

পরাণ কৈবর্ত্ত চিরদিনের রগচটা লোক, সে-কথা তার ঘরের লোকই বা শুধু কেন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও অজানিত নয়। এইখানেই ত তার জন্ম-কর্ম্ম সমস্তই, তার রীতি প্রকৃতি তাই না জানেই বা কে? কিন্তু কথা এই যে, ওই ধরণের স্বভাবের লোকদের সঙ্গে কারবারে আসিতে হইলে অপর পক্ষদেরও একটুখানি বেশী সহ্যগুণের প্রয়োজন থাকে। এরা ঠিক দাবানলও নয়, কালানলও নয়, মাত্র তৃণগুচ্ছ। এক মুহূর্ত্তেই তাহারা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু সে জ্বলন তাদের তেমনি বেশীক্ষণও থাকে না, যদি না ইন্ধন যোগাইয়া দেওয়া হয়; তবে অল্পক্ষণেই আপনার আগুনে আপনি জ্বলিয়া ছাই হইয়া নিবিয়া যায়। সেই ছাইও আবার বাতাসে উড়িয়া যাইতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না, কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বচিহ্নের অস্তিত্ব খুঁজিলে অল্পই পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যখন পরাণের মা থাকোমণি বাঁচিয়া ছিল, তা'র হাজামজা বাবাঠাকুরের দোর-ধরা তাবিচ-কবচের বোঝা-পরা একমাত্র ছেলেকে সে সদা-শঙ্কিত সাবধানতার সঙ্গেই চোখে চোখে রাখিয়া মুখে মুখে তার প্রয়োজন সাধন করিয়া গিয়াছে। ক্ষুধা পাইবার পূর্ব্বেই সাজানো অন্ন, তৃষ্ণানুভবের আগেভাগেই জলের ঘটি, বিশ্রামের জন্য সর্ব্বদাই পরিপাটিরূপে স্বহস্তে প্রস্তুত শীতলপাটি পাতা শয্যা, যখন যা কিছু প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তুজাত তার মায়ের হাত হইতে সে লাভ করিয়াছে। বাপ তার জন্য খুসীই ছিল। মায়ের লালন সেও তার

অবশ্যপ্রাপ্য রাজকরের মত অলঙ্ঘনীয় প্রাপ্য বলিয়া মনে করিত। এক ছেলে গরীবের ঘরেই কি, আর বড়লোকের ঘরেই বা কি, একই ভাগ্য লইয়া জন্মায়। অবশ্য সোনার চামচ মুখে করিয়া কেহই আসে না, সেটা ঠিকই; তবে সোনার জলে ধুইয়া যায় তাদের মায়ের চোখ ছুটি, কোথাও কোথাও বাপেরও। আর সেইখানেই বিপদের ভবিষ্য বোঝা ভারী হইয়া উঠিতে থাকে। উভয় পক্ষেই যদি "লালন" চলে, "তাড়না"র নাম থাকে না, পুত্র যথাকালে মিত্র হইতে পারে না। পরাণের বাপের চাইতে তার মা কিছু বেশী দিন বাঁচিয়াছিল। তার যখন মৃত্যু হয়, তখন পরাণের ঘরের নূতন বউ পুরাতন হইতে চলিয়াছে। নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া এগারো বছরে জয়ত্বর্গা ঘর বসত করিতে শ্বশুরঘরে আসিয়া বসিল। সেও প্রায় তিন বৎসর আগের কথা। পাড়ার হিসাবে তার বয়স পৌণে এক কুড়ি হইতে চলিয়াছে, অথচ থাকোমণিকে সে একটি পৌত্র রত্ন দিবার নামও করিল না। বধূর এই অন্যায় অনাচারে পরাণের মা ভিতরে বাহিরে সত্য করিয়াই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। পাড়ার পাঁচজনেও ইতিমধ্যে বলাবলি করিতে সুরু করিয়াছে যে, "বউটা বাঁজা তালগাছ হলো নাকি লো? হাঁ পরাণের মা, নাতি কি আমাদের মিষ্টি খাওয়াবার ভয়ে পালিয়ে রৈল নাকি গা? বয়েস ত বৌমার গড়িয়ে এল, আর হবে কবে?"

প্রথম প্রথম থাকো এ-সব পরিহাসের হিসাবেই হাসিমুখে গ্রহণ করিয়া যথোচিত ভাবেই প্রত্যুত্তর দিয়াছে; কিন্তু ক্রমশঃ পাঁচ মুখে পাঁচ কথা শুনিতে শুনিতে তার স্নেহ-তুর্ব্বল মন আশঙ্কা-চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাইতো, সত্যিই তো, সেই কবে বিয়ে হয়েছে, এতদিনে একটি সন্তান হইতে পারিত। বাড়ীর তুলসীতলায় ও 'বাবাঠাকুরে'র উদ্দেশ্যে মানত করিল, ব্রাহ্মণপাড়ার

রাধাঠাকুরাণীর কাছে দৈব-মাদুলী ভিক্ষা করিয়া স' পাঁচ আনা পয়সা বধূর মস্তকে ছোঁয়াইয়া রাখিয়া সেই মাদুলী তাহাকে পরাইয়া দিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তথাপি হা-পুত্রের ঘরে পুত্র আসিল না।

প্রথম সন্তানের জন্য গ্রামান্তরের অত বড় জাগ্রত যে 'বাবাঠাকুর' তাহাকে পুত্রদান দিয়েছেন, তাঁর আশ্রয় লওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার কার্য্যবিভাগ শুধু মৃতবৎসাদেরই জন্য। জয়দুর্গা শাশুড়ীর নিদারুণ মনকষ্টের প্রতি তিলেক ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই যথাপূর্ব্ব হাসিয়া খেলিয়া স্বামীর সহিত ঝগড়া ও ভাব করিয়া, শাশুড়ীর প্রতি ঝঙ্কার ঝাড়িয়া দিনের পর দিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। আদুরে সেও বড় কম হয় নাই, বাপের বাড়ীতে শাসন সহবৎ সে অল্পই শিখিয়াছে। প্রথম দিকে একমাত্র ছেলের বউ বলিয়া শাশুড়ীও বড় অল্প প্রশ্রয় দেয় নাই। পাড়ার পাঁচটা মেয়ে জড়ো করিয়া অষ্টাকষ্টে, কড়িখেলা, জল ডেঙ্গাডেঙ্গি, খোন্তাখুনি প্রভৃতি খেলা ও হুড় করিয়াই সে কাটাইত। কিন্তু এমন করিয়া বেশী দিন গেল না। এইবার থাকো তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, রুখিয়া বলিল, "খেয়ে খেয়ে হাতি হচ্চ ; ছেলেপিলে হবে কোত্থেকে ? পরাণের আমি আবার বিয়ে দোব।"

প্রথমে রাখিয়া ঢাকিয়া, শেষে সর্ব্বসাক্ষাতেই এই রটনা চলিতে লাগিল। বউয়ের মুখের উপরেও অবশেষে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় একদিন শাশুড়ী প্রচার করিয়া দিল, "আর তিনটে মাস আমি দেখবো। তারপর আর আমায় কেউ আটকাতে পারবে না। তিলু কৈবর্ত্তের ঝিয়ের সঙ্গে কথা আমি কয়েই রেখেছি।"

আশপাশ হইতে যে সব কথা কানে আসিতেছিল, মুখোমুখি হইবামাত্র জয়দুর্গা তেলে-পড়া বেগুনের মত ছ্যাঁক্ করিয়া উঠিল,

"দেবে ত দেবে! ছেলে কি তোমাদের আমি পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি নাকি? এমন জ্বালাও ত দেখিনি।"

উত্তর হয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু কথাই আছে, বুদ্ধিমান যেখানে কথা খুঁজিয়া পায় না, মূর্খ সেখানে নির্ভয়ে জবাব চালাইয়া যায়। থাকো বধূর চোপা শুনিয়া চটিয়া উঠিল, "চুরি করবি কেন? সাত জন্মের বাঁজি যে তুই, ছেলে হবে কোত্থেকে! তিলুর মেয়ে আতুসীর সঙ্গে বিয়ে আমি ঠিকই করেছি।"

বৌ বলিল, "দে দিকিনি, কেমন দিবি, দেখি! সতীন আমি সইবোনা, তাই এই মা কালী আর বাবাঠাকুরের নাম নিয়ে দিব্বি খেয়ে বলে দিচ্ছি, ঘরে আনবি কি সগুষ্ঠি বেড়া আগুনে পুড়ে মরবি। দরজায় শেকল দিয়ে ঘরের চালে আগুন জ্বালিয়ে দোব; এই সোজা বলে রাখলুম।"

এরপর শাশুড়ী তারস্বরে বধূর উদ্দেশ্যে অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যতই দম্ভ প্রকাশ করুক না কেন, ছেলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা সে আর ভরসা করিয়া করিতে পারিল না। অগত্যা মাস পাঁচ-ছয় পরে তিলু কৈবর্ত্ত তার ডাগর মেয়ে আতুসীর অন্যত্র বিবাহ দিয়া দিল। জয়দুর্গা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, হাসিতে হাসিতে শাশুড়ীকে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "কি, ছেলের বিয়ে দিলে না যে বড়? বলে,—'সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, প্রাণ যায় মোচ্ছব দিতে।'

শাশুড়ী নিজের মনের জ্বালায় নিজেই জ্বলিতেছিল, বৌয়ের এই কাটা ঘায়ে লবণ নিষেক তার সহিবে কি করিয়া; তাই দপ্ করিয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিল, দাঁত কিড়মিড় করিয়া অকথ্য ভাষায় গালি দিল, পরে বলিল, "তুই না ম'লে কোন ভাল মানুষের মেয়েকে পুড়িয়ে মারবার জন্য তোর হাতে তুলে দেবো না, ভাল থাকি?"

কথাটা নিছক সত্য! জয়দুর্গাও তা ভাল করিয়াই জানে, আর জানে বলিয়াই তার এই বিজয়োল্লাস! শাশুড়ীর এই বুক-ভাঙ্গা দুঃখে গালিগালাজকে তুচ্ছ করিয়া লইয়া ফেরৎ জবাব উহ্য রাখিয়াই একান্ত সহানুভূতির সুরেই সে বলিল, "আহা তা' সত্যি!" তারপর আবার মুখ টিপিয়া ঈষৎ ক্রুর ও বক্রহাসি হাসিল ; তার পর টিপ্পনি কাটিয়া বলিল, "শুধু তাই নয়, ঢাকের দামে আবার মনসাশুদ্ধ বিকোবে কিনা, দাদাশ্বশুরের পিণ্ডির জোগাড় করতে গিয়ে নিজের পিণ্ডি চটকাবার ব্যবস্থা হয়ে ওঠবার যে ভয় রয়েছে।"—

হি-হি হি-হি হাসির শব্দে থাকোমণির সর্ব্বাঙ্গে গরম জলের ঝাপটার মতই গরম রক্তের অন্তঃস্রোত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। জঘন্য গালি দিয়া চীৎকার শব্দে কাঁদিয়া বাড়াভাতের কাঁসি লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া অবশেষে ছেলে বাড়ী ফিরিলে তাহার কাছে নিজের পরাভবের কথা নালিশ করিল। এতদিন যা করিবার সে নিজে করিয়াছে, ছেলেকে বউয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে কোনদিন চেষ্টা করে নাই। কেন করে নাই তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না, সবটাই যে বধূর প্রতি পূর্ব্বতন ভালবাসার জের তা নাও হইতে পারে, নিজের কর্তৃত্ব শক্তির প্রতি একটা স্থির বিশ্বাসও এর মধ্যে ছিল। ঘরকন্নার মধ্যে সে তার স্বামীকেও কোনদিন টানাটানি করেন নাই, ছেলেকেও না। বেটাছেলের পক্ষে বাহিরের কাজই যথেষ্ট ; ওরা কি এইসব 'ঘরকুটুলী' ব্যাপারের মধ্যে থাকিতে পারে, না ডাকিতে আছে ? কিন্তু সহ্যেরও ত একটা শেষ আছে। ছেলের কাছে এতদিনকার জমাইয়া রাখা মনের কথা আজ থাকোমণি কান্না-ধরা গলায় একটি একটি করিয়া সমস্তই খুলিয়াই বলিল ; বলিতে বলিতে বারে বারে পিছন ফিরিয়া খিড়কির দরজার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল পুকুরঘাট হইতে জয়দুর্গা ফিরিয়া আসিতেছে কি না।

পরাণ যে মায়ের একমাত্র সন্তান বলিয়া মাতৃভক্তিতে খুবই তদ্‌গত ছিল তা' বলিতে পারি না। বরং সংসারে দেখা যায় যে-সব ছেলে মায়ের বেশী আদুরে তারাই মায়ের প্রতি অনাসক্ত ও অশ্রদ্ধাকারী হয়! হয়ত হওয়া উচিত, হয়ত ইহাই মাতৃ-কর্ত্তব্যের অবহেলার প্রতিফল। যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সেটা ঠিকই ফলিয়াছিল। মায়ের প্রতি আশৈশব আজ পর্য্যন্ত পরাণের অত্যাচারের সীমা ছিল না। এতটুকু ত্রুটি পরাণের মা ঘটিতে দিত না তাই রক্ষা, নহিলে তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ধরিয়া টিকটিক খিটখিট সে করিয়াই আছে। আজ কিন্তু কোথা হইতে এতদিনকার প্রসুপ্ত মাতৃভক্তি সহসা উথলিয়া উঠিল, অবশ্য তার একটা বড় রকম অগ্রবর্ত্তী কারণও বর্ত্তমান ছিল। জয়দুর্গা দেখিতে এমন কিছু ভাল নয়, তার উপর আবার থাকোর কথামত "খাইয়া খাইয়া" সে দিনকের দিন সত্যসত্যই একটি ক্ষুদ্র হস্তিনীমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল। গালের মাংসপিণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র চক্ষু ক্ষুদ্রতর হইয়া ডুবিয়া যাইবার জোগাড় করিয়াছে। এদিকে মাথায় খাটো মানুষ, আর একটু মাংস লাগিলেই ভাঁটার মত গড়াইয়া দেওয়া চলিবে, মাঠে লইয়া গিয়া ফুটবল খেলার কাজেও লাগিতে পারে। এ কথা সে স্ত্রীকে জানাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে নাই এবং পরিবর্ত্তে তার থ্যাবড়া নাক এবং তাল-পত্রে প্রস্তুত সিপাহীর মত লম্বা চাঁচাছোলা পাকসিটে মূর্ত্তির বিরুদ্ধে অজস্র কুৎসা প্রচারিত হইতেও শুনিয়াছে। তিলুর মেয়ের চেহারা এদিকের নয়, তার ছিপছিপে গড়ন পেটন তেমন না হোক, চেহারায় একটা জৌলুষ আছে! তাহাকে বধূ করিতে মায়ের সঙ্কোচকে সে প্রশংসনীয় মনে করে নাই, আজ সুবিধা পাইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "তুই পোড়ারমুখীই ত যত নষ্টের গোড়া। ঐ রাক্ষুসীটার ভয়ে এমন মেয়েটাকে হাতছাড়া করলি!"

থাকোর মনেও সে বিষয়ে আফশোষ বড় কম ছিল না। কান্না-কাতর কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "কি করি বল ধন, খাল কেটে যে কুমীর এনে ঘরে তুলেছি, বলে কি না ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যা দস্যি ছুঁড়ি, অনায়াসে তা পারে।"

"ইস্, পারলেই হোল। বল্লি না কেন আমায় সে কথা, দেখে নিতুম সে কাকে পুড়িয়ে মারে। দিতুম এক বোতল কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে শলাই ধরিয়ে। শুধু অমন কনেটাকে তুই ঐ মাদি-হাতীটার হুকমীতে কিনা ছেড়ে দিলি!"

ছেলের পৌরুষ জাগিতে দেখিয়া হঠাৎ থাকোর সহজ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল—"কি যে বলিস্ গোপাল! এই ত ওর সবে পনেরটা বছর বয়স। রাধা ঠাকরুণ বলছিল—আঠোর বছর বয়স পার না হলে মেয়েদের বাঁজা বলা যায় না। যাক্ যাক্, ও সব কথা তুই ভাবিস্ নে, সে আমি সময় বুঝে যেমন হয় করবো।"

দুই

সময় বুঝিবার কিন্তু সময় আর হইল না। থাকোমণি পৌত্র-মুখ না দেখিয়াই মরিল, জয়কালী শাশুড়ীর মৃত্যুকালে সেবা করিয়াছিল। জমানো টাকা ছেলেকে ও হাতের সোনার তাগাগাছি বউকে দিয়া গলার মাদুলিশুদ্ধ বিছে হার সে অনাগত পৌত্রের জন্য রাখিয়া গেল। রাধাঠাকরুণ বলেছেন আঠারো বছর বয়স হলেই জয়দুর্গার সন্তান হবে।

আঠারোর পর আরও বছর দুই গেল, ছেলের দেখা নাই। তা নাই থাক, তার জন্য আজ কেহ কাঁদিতেছে না। যে কাঁদিত সে তার কান্না সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। পরাণের স্ফূর্ত্তির প্রাণে ছেলেমেয়ের জন্য কোন প্রতীক্ষিত উৎকণ্ঠাই ছিল না। জয়দুর্গার মনের মধ্যে

যাই থাক, মুখে সে দম্ভ ভরিয়া বলিত, "দূর দূর, ছেলে নিয়ে কি করবো, ছেলে হলে তার বাপের মতনই হবে। ধেনো গিলে গিলে নোংরা কথা, পচা খেউড় গেয়ে গেয়ে বেড়াবে। পোড়া কপাল, ঝাঁটা মার অমন ছেলের মুখে। যদি ভুলেও জন্মাতে আসে আমার কাছে, জন্মমাত্তর পা ধরে পাথরে আছড়াব, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

অলক্ষিত থাকিয়া সে কথা হয়ত বা জন্মসম্ভাবিত সন্তান শুনিয়া থাকিবে, এ পথে সে পা বাড়াইল না।

এদিকে পরাণের বখামি যত দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল, জয়-দুর্গার রসনা ততই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদের কোন্দলের কোলাহলে প্রতিবেশীদের কান ও প্রাণ ঝালাপালা হইবার উপক্রম করিয়াছিল। নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তীরা উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া অবশেষে হার মানিয়া নিরস্ত হইয়াছে। বুঝাইয়া কিছু বলিতে গেলে পরাণ বলে, "হয়েছে কি এখুনি, ওকে খুন করবো, তবে না ঠাণ্ডা হবো।"

জয়দুর্গা গোঁজ খোঁপার সঙ্গে সমানভাবে মুখ গোঁজ করিয়া গজরাইতে থাকে, "আমিই কি ছাড়বো না কি ? একসঙ্গে দুটো খুন করে হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে গিয়ে চড়বো। ফাঁসি দেবে, দেবে ; একবারই না দেবে। দু'বার ত আর দিতে পারবে না।"

আর এই অতি নির্ভীক ও সতেজ অভিব্যক্তিতে যে গোপন রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত ছিল, সে কথা লইয়া ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। তিলু কৈবর্ত্তর বিধবা মেয়ে আতুসীকে লইয়াই সে প্রসঙ্গ। কিন্তু জয়দুর্গার মুখর মুখের কুৎসা রটান ব্যতীত অন্য কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাইলে গ্রাম্যমুখ্যরা ত তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না।

তারপর অকস্মাৎ সেই চরম পরিণতির কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বরাত্রে সারারাত্রি অনুপস্থিত স্বামীর নিকট জয়দুর্গা গরুর খড় কুচাইতে কুচাইতে এমন সুরে ও বাক্যে কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিল যে, পুরুষের দেহ ধারণ করিয়া সে রকম অভিভাবকের মত মুখভঙ্গী এবং কণ্ঠকাঠিন্য সহ্য করা সম্ভবপর নয়। পরাণ হাতে শক্ত মুঠি বাঁধিয়া খানিকটা সামনের দিকে আগাইয়া আসিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল, "যে চুলোতেই থাকি না কেন, তোর বাবার তাতে কি এলো গেলো?" জয়দুর্গা যথাকার্য্যে নিরত রহিয়াই সদর্পে প্রত্যুত্তর করিল, "আমার বাবার কচু, জানা দরকার আমার। আমি শুনতে চাই, কোন্ চুলোর দোরে মরতে গেছলে সারারাত ধরে!"

রাগে পরাণ ফুলিতেছিল, গুম্ হইয়া জবাব করিল, "যমের দক্ষিণ দোরে, যাবি?" "নিয়ে চলো না সঙ্গে করে, যাচ্ছি"—বলিতে বলিতে কুক্ষণেই সে তার বিচালী কাটা খাঁড়ার মত একান্ত তীক্ষ্ণ ফলা বঁাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "সে হলেও বুঝি, যমেই বা তোকে নেয় কোথায়? তুই যে যমেরও অরুচি?"

কথায় উত্তর না দিয়া পরাণ প্রচণ্ড রাগের মাথায় যাহা করিয়া বসিল তাহা এই,—সে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিত্যক্ত বঁটিখানা তুলিয়া লইয়া দুইহাতে বঁাটখানা চাপিয়া ধরিয়া জয়দুর্গাকে যেখানে-সেখানে চোপাইয়া দিল। আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ, তার পরই রক্তাক্ত কলেবরে জয়দুর্গা সংজ্ঞা হারাইয়া সশব্দে মেজের উপর পড়িয়া গেল।

তিন

সকলেই মনে করিয়াছিল পরাণের ফাঁসী হইবে। তার দক্ষিণ ধারের প্রতিবেশী তার বাড়ীখানা কিভাবে দখল করা যায় তার

জন্য গভীর চিন্তায় ডুবিয়া থাকিয়া নানাপ্রকার ফিকির ফন্দি বাহির করিতেছিল, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া সমস্তই উল্টাইয়া দিল।

জয়দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে মরে নাই, সদরের হাসপাতালে তৃতীয় দিনে তার জ্ঞান হইতেই হাকিম সদলবলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আসিলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং কণ্ঠাগত প্রাণ হইলে কি হয়, ডাক্তারের মতে যখন তার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন তাঁদের কর্ত্তব্য পালন অবিলম্বে না হইলে চলিবে কিরূপে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই সে বলিয়া বসিল—তার স্বামী তাহাকে আঘাত করে নাই, সে নিজেই নিজেকে আহত করিয়াছে।

প্রশ্নকারী সবিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি, পাশের বাড়ীর লোক যে দেখেছে বঁটি ছিল পরাণের হাতে?"

নারী কহিল, "তোমার বউ যদি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যে হতে যায়, তুমি তার হাত থেকে অস্তর ছিনিয়ে নিতে যাবে না?"

প্রশ্নকারী প্রতি প্রশ্নের জটিলতায় ক্ষণকাল বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, পরে ঐ কূট প্রশ্নের-কুটিলতা এড়াইয়া গিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে তুমি বলতে চাও তোমার স্বামী তোমায় মারে নি?"

"ও মা, বলতে চাই কি রকম? তোমাদের দরকারে হয়কে নয় করবো নাকি? কেন, আমায় ও মারবে কেন? আমি কি ওর মতন কু-চরিত্তির যে ও আসবে আমায় খুন করতে?"

"তুমিই বা হঠাৎ আত্মহত্যা করতে গেলে কি জন্যে?"

"শোন কথা! আত্মহত্যে হঠাৎ না করে চোখে কাজল পরে, কপালে টিপ কেটে, পায়ে আলতা দিয়ে, ঠোঁটে রং লাগিয়ে তোমাদের বড় নোকেদের ঘরে করে বুঝি? নাঃ বাপু, আমাদের সে-সব নেই,—আমরা করলে এম্‌নি হঠাৎই করি।"

প্রশ্নকারী বিব্রত বপন্নতার সহিত তাড়াতাড়ি করিয়া বলিলেন, "না না, তা'তো বলিনি ; তবে এরকম রাগ কেন হলো ? রাগের কারণটা কি তাই জানতে চাইছি।"

"জিজ্ঞেস করলেই পারতে তোমাদের সেই মুখপোড়া যমের অরুচি পুষ্যিপুত্তুরকে ! কেন করলুম ? রাগে ঘেন্নায় মানুষ পাগল হয়ে যায় না ! কু-চরিত্তিরকে নিয়ে ঘর করতে রুচি কতদিন থাকে মানুষের বল ত ? সহ্যির তো একটা সীমা আছে ! কোন্ চুলোমুখীর চুলোর দোরে সারারাত কাটিয়ে বাড়ী ফিরেছিল সেটা ওকে তোমরা বুঝি শুধোতে পারনি ? কেন লজ্জা করেছিল ?"

স্বামী-স্ত্রীতে দেখা করাইয়া দেওয়া কর্ত্তৃপক্ষরা হয়ত কর্ত্তব্য বোধ করিয়া ছিলেন। পরাণ কাঁদিয়া আপত্তি করিলেও শুনিলেন না। যখন জয়দুর্গার সঙ্গে তার দেখা হইল তখন তাহার মুমূর্ষু অবস্থা। গলার স্বর গলা দিয়া বাহির হইতে চায় না, কানেও সহজে বাহিরের স্বর ঢোকে না। তথাপি দর্শকের পরিচয় বারবার করিয়া জানানো হইলে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্র বারেক মাত্র উন্মীলন করিয়া সে তার সম্মুখে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। চোখে জাল পড়িয়া গিয়াছে, সমস্তই তার কাছে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট, নাভিশ্বাসের ঘন ঘন আন্দোলনে অতবড় শরীরটা তার ঢেউয়ে পড়া ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতই সমানে আন্দোলিত হইতেছিল, তাহারই মধ্য হইতে জয়দুর্গা কোনমতে এই কথা কয়টা মাত্র বলিল ঃ

"ওকে বলো যেন গয়ার পেরেত শিলেয় গিয়ে একটা পিণ্ডি চটকায়, নইলে কি পেত্নী হয়ে শেষে ওর আর ওর সেই হতচ্ছাড়ি সোহাগী আঁচল-হুলুনীর ঘাড় ভাঙ্গবো ?"

পরাণকে জয়দুর্গা ফাঁসী বা আন্দামন গমন হইতে বাঁচাইয়া দিয়া গেলেও তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি গ্রামের লোকেরা কেহই

বিশ্বাস করে নাই। যারা এতদিন তার মুখর কলহপরায়ণতায় তাকে নিন্দা-বিদ্বেষ করিয়া আসিয়াছিল, তারাই স্তম্ভিতচিত্তে তার প্রশংসা না করিয়া পারিল না। পরাণকে খুনে বলিয়া সকলেই মনে মনে শিহরিয়া রহিল। তার মুক্তি তারা বেশ মনের সঙ্গে পছন্দ করিতে পারিল না। স-সর্প গৃহে বাস করার মতই এই হত্যাকারীকে নিজেদের ভিতর রাখা একটুও নিরাপদ নয়, এ-কথা প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করিল, কিন্তু প্রকাশ্যে বিরোধিতা করিবার মত সাহস কেহই সঞ্চয় করিতে পারিল না। দক্ষিণধারের প্রতিবেশীই এ ঘটনায় সবিশেষ আশাহত হইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আত্মগতই তিনি বলিলেন, "হরি হে দীনবন্ধু ! তুমিও শেষকালে তোমার নাম ডোবালে ? কলিকালে পাপীরই বন্ধু হলে ? তা' হও, কি করবে, তোমার আর দোষ কি ? যুগের হাওয়া।"

কিন্তু বেশীদিন নয়, পরাণ শীঘ্রই ইহাদের মুক্তি দিল। সেও আর এ ঘটনার পরে তার চিরপরিচিতদের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। সে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিতেছিল যে, তার আজীবনের পরিচিতরা তাকে আর ঠিক স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না। এই কয়টা দিন হাজত বাস করিয়া আসিয়াই সে যেন তাদের আগেকার চিরপরিচিত সেই পরাণ কৈবর্ত্ত আর নয়—একজন ঘোর অপরিচিত ব্যক্তি, যার সমস্তটাই রহস্যময় কঠিন আবরণের মধ্যে সকলের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তার প্রতি পদক্ষেপে লোকে পিছনে হটিয়া যায়, গলার স্বর শুনিলে মানুষ চমকিয়া নীরব হইয়া পড়ে, মুখের হাসি সন্দেহের ছায়ায় আত্মগোপন করে। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক লোকের প্রতিটি ব্যবহারে অব্যক্ত ভাষায় তার স্বরে ধ্বনিত হইতে থাকে, "আইনের চোখে পার পেয়ে এলেও—ও খূনী —ও খূনী ! নাঃ, জয়দুর্গা প্রতিশোধ লইয়াছে বটে !"

যেমন তেমন দামে বাড়ীঘর, তৈজসপত্র বেচিয়া পরাণ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অতসীর সঙ্গে সে ফিরিয়া আসিয়া আর দেখা করে নাই, জন্মের মত যখন বিদায় লইতেছে তখন একবারের জন্য সে দারুণ প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল, জয়দুর্গা যদি তাকে সে ঘটনার পর ক্ষমা করিতে পারে, অতসী কি পারিবে না? জয়দুর্গাকে সে একদিনের জন্যও ভালবাসে নাই, কিন্তু অতসী ত জানে তাকে সে কতখানি ভালবাসিয়াছিল। মায়ের দেওয়া টাকা, অনাগত সন্তানের মাদুলীহার, নিজের সখের সৌখীন টুকিটাকি সমস্তই ত সে তার ভালবাসার নিদর্শন অতসীকেই দিয়াছে। আজও জয়দুর্গার সোনার তাগা, কানফুল, নাকছাবি, রূপার গোট, চাবিশিক্‌লি, রূপার চুড়ী, পায়ের কড়াচুট্‌কী তাকেই দিতে পারে, সে কি সঙ্গে যায় না? বাড়ী জমি বিক্রির টাকা দিয়া কোন অজ্ঞাত গ্রামে গিয়া, না হয় সহরে পৌঁছিয়া তারা নূতন করিয়া ঘরকন্না পাতিবে। মাছ আর ধরিবে না, কল-কারখানায় আজকাল কত রকম-বেরকমের কাজ।

অতসী তাহাকে দেখিয়া একছুটে পলাইয়া যাইতেছিল। তার কঠিন স্বরের পিছু ডাকে সভয়ে পিছন ফিরিল বটে, কিন্তু ভরসা করিয়া খুব কাছাকাছি আসিতে পারিল না, খানিকটা দূর হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" ঐটুকু স্বর হইতেই তার বক্ষস্পন্দনের অস্বাভাবিক গতির পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

পরাণের বুকটাও ভিতরে ভিতরে ভারী হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াও অনেকখানি ইতস্ততঃ করিয়াই সে কহিল, "আমি গাঁ ছেড়ে যাচ্ছি।"

অতসী যথাপূর্ব্ব থাকিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিল, "শুনেছি"—

"হ্যাঁ, বাড়ীঘর সমস্তই বেচে ফেলে নগদ টাকা করেছি, শুধু গয়নাগুলো যেমন তেমনই আছে।

অতসী কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না, শুধু তার শুষ্ককণ্ঠ মধ্য হইতে একটা অস্পষ্ট নীরস ধ্বনি বাহির হইল,—"ও!"

"কলকাতায় গিয়ে ভাবছি কল-কারখানায় কাজ করবো, খাটতে পারলে সেখানে একশ টাকাও রোজগার করা যায় সবাই বলে।"

অতসী এইবার একটা কিছু বলিবে—পরাণ মনে মনে এরূপ আশা করিয়াছিল; সে কিন্তু কিছুই বলিল না, যেমন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। পরাণের গ্রাম ত্যাগের খবরে হয়ত একটুখানি স্বস্তিবোধ যেন তার মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই ব্যাপার লইয়া তার উপরেও ঘরে বাহিরে যে একটা কুৎসিত রটনা না চলিতেছিল এমন নয়।

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে অতসী? দুজনায় আমরা আবার নতুন করে ঘর বাঁধবো, তুমি সেখানে—"

"আ-মি?" অতসী সহসা বেতসীর মতই সঘনে কাঁপিয়া উঠিল। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "তোমার সঙ্গে? ওরে বাবা! না—না—না, তোমার সঙ্গে আমি যাবো না—যাবো না।"

পরাণের বুকের ভিতর একটা বোমা যেন সে নিজের হাতে দাগিয়া দিল; বহুক্ষণ পরে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া আসিলে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল অতসী কোথাও নাই। অদূরে তাদের খিড়কী দরজায় খড়াৎ করিয়া খিল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের শব্দ শোনা গেল,—

"কিরে আতু! অমন করে ছুটে এলি ক্যানে? হলো কি তোর?"

"ওমা, সেই খুনে এয়েছে গো! বলেক, 'আমার সঙ্গে চল্'! উঃ, ভয়ে আমার গা,—হাত দে দেখ না, এখনও কাঁপচে গো!"

"ঘরকে আসুক না তোর বাপ, পুলিশকে খবর দিতে বলছি!

আ, মর্ মর্! মুখপুড়ি ছুঁড়ি অমন গুণের সোয়ামীকে আবার সোহাগ করে বাঁচিয়ে গেলেন! আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অতসী হাস্যকম্পিত স্বরে মন্তব্য করিল, "যমেরও অরুচি যে ও—যম ওকে নেবেক ক্যানে।"

এবার আর তার কণ্ঠস্বরে ভয়ের কম্পন ছিল না, কৌতুক উছলিত হইতেছিল।

মা বলিল, "তাই বটেক, কি গর্ব্বেই ধরেছিল—থাকি আঁটকুড়ী! আঁতুড়ে নুন জোটাতে পারেক নাই একটুক্!"

পরাণের দুচোখ বারেকমাত্র জ্বলন্ত কয়লার মতই দপদপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেও পরক্ষণে যেন বরুণবাণে নির্ব্বাপিত অগ্নিবাণের মতই তার সেই দুচোখের অগ্নিশিখা একান্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। দুচোখ ভর্ত্তি সহসা সমাগত অনাহুত অশ্রুর আবিলতায় সে প্রায় অন্ধের মত স্খলিত পদে যে-পথে আসিয়াছিল তাহারই অভিমুখে ফিরিয়া চলিল, গভীর দীর্ঘশ্বাসের ভারে ভারাক্রান্ত বক্ষ ফুলিয়া উঠিতেছিল, আর্ত্তনাদের মতই তার অবরুদ্ধ-স্বর কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ মাত্র বাহির হইল, "জয়ি, জয়ি! তোকে আমি চিনিনি, তুই দেবতা, আমি পিচেশ।"

দিব্যেন্দুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ অনেকদিনই হয়েছিল কিন্তু চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান বহুকাল পর্য্যন্ত বজায় থেকেছে। কলেজ ছাড়ার পর আমি ঢুকলুম ডাক্তারী লাইনে, আর সে পড়াশুনো ছেড়েই দিলে। তা দেবে নাই বা কেন, প্রথম গ্রেট ওয়ারে ওর বাবা তো আর কম টাকাটা ব্যবসা করে লাভ করেননি। শুনেছি সে এত বেশী যে তার নিম্নতন তিন পুরুষে নাকি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে অর্থাৎ বেশ একটি স্প্রিংয়ের গদি-আঁটা প্রশস্ত ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে জীবনগুলো কাটিয়ে দিতে পারবেন। অবশ্য যতটা রটে, সবটাই ঘটে না, তবু কিছু কিছু তো বটেই! একথাটাও তো আর অসত্য নয়। দিব্যেন্দু তার বাপের কাজ-কর্ম্মের সাহায্যও নাকি কতকটা করেছিল, ওর বাবার তখন লোহার কারবারে মোটামুটি সোনা ফলছে। বছর কতক পরে ওর বাবা হঠাৎ মারা পড়লেন, তার বছর দু'বছর পরেই শুনলুম দিব্যেন্দু তার সোনা-ফলা লোহার কারবার খুব মোটা একটা টাকা নিয়ে কোন্ এক মাড়োয়ারীকে বিক্রি করে দিয়েছে। বড়ই চটে গেলুম। বাঙ্গালীকে ঐ রোগেই তো মেরেছে! আর এই করে করেই মাড়োয়ার হয়ে উঠেছে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এবং বাংলা দেশটি হয়ে দাঁড়াচ্চে ধুধু মরু! দুদিন পরে এর শুক্‌নো গাছের ডালে ডালে যে পাখীরা শুধু ডাকতে থাকবে, তাদের ধ্বনি হচ্চে—'ঘু-ঘু-ঘু ঘু-ঘু-ঘু!' এবং বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এরাই বিচরণ করবে। চিঠি লিখলুম,—'তোমার বাবার কষ্টোপার্জ্জিত অতবড় কারবারটা এমন করে নষ্ট করলে, এর মানে কি?'

উত্তর দিলে, 'এখন নয়, দুটো বছর পরে বুঝতে পারবে মানে কি!'

১৯২৭-২৮ সাল থেকে পৃথিবীর সর্ব্ববিধ বাজারই পড়তে আরম্ভ

করলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীজোড়া সবচেয়ে বড় যুদ্ধের বীজ পোঁতা হলো ; কিন্তু মানুষ বড়জোর অদূর ভবিষ্যৎই দেখতে পায়, সে তো সুর্ব্বদর্শী নয়, ঐ লোহাই যে আবার সোনার চাইতেও বড় হয়ে উঠবে তখন সেকথা কেউ কি জানতো।

দিব্যেন্দু ইছামতীর তীরে বিশাল জমিদারী কিনে সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাসানে বাড়ী তৈরী করিয়ে সমস্ত নাগরিক সভ্যতার বাইরে গিয়ে বাস করছে, বিয়ে সে আগেই করেছিল,—এই পর্য্যন্ত খবর তার চিঠিপত্রে পেয়েছিলাম। বিয়ের সময় অবসর করে সেখানে যাবার জন্যেও সে আমায় একটা চিঠি মারফৎ আমন্ত্রণ করেছিল। তার পর থেকে বছর দুই তাদের কোন খবরাখবর পাইনি ; বলা বাহুল্য, আমারও খবর নেবার অবসর তখন একেবারেই ছিল না। নতুন একটা তীব্রতম বিষ-প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করে—আমি তখন তাই নিয়ে একটা সাধনায় মগ্ন হয়ে ছিলাম।

আমার সাধনা সফল হয়েছে। শুধু সাপের বিষই নয়,—সময়ে প্রয়োগ করতে পারলে আর্সেনিক এমন কি পটাসিয়াম সায়নাইডের প্রচণ্ড বিষক্রিয়াকে পর্য্যন্তও পরাভব করে ফেলতে সমর্থ।

অভাবনীয় রূপেই এতবড় মহৌষধ আমার হাত দিয়ে ভগবান মানব সমাজকে দান করলেন। সেও এক উপকথার কাহিনীর মতই চমকপ্রদ অদ্ভুত ব্যাপার। আচ্ছা, দিব্যেন্দু এখন একটু সরেই দাঁড়াক না, সেই কথাটাই আগে বলি, এই দুটো ব্যাপার তো পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় ; সেই কাহিনীটা আগে থেকে এখানে বলে রাখা ভাল। সে একটা বসন্তকালের সন্ধ্যা। কলকাতায় থাকি, সেখানে অবশ্য শীত-বসন্তের কোন মূর্ত্ত পরিচয় আমরা পাইনে ; ওসব ঋতুগুলি আমাদের কাছে প্রায় অবান্তর এবং অনাবশ্যক। অতি ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ও কারবার আমাদের যা

আছে তা' বরং এই দুটি ঋতুর সঙ্গে ; একটি গ্রীষ্ম, একটি বর্ষা। গ্রীষ্ম ঋতুটি যত কষ্টকরই হোক, যাদের ইলেকট্রিক-ফ্যানের হাওয়া খাওয়ার মত সৌভাগ্য আছে, তাদের কথা ছেড়ে দিলেও তালপাতার পাখাতেও কিছু-কিঞ্চিৎ কষ্ট লাঘব হতে পারে। ঘরের ফাটা-চটা মেঝেয় শুয়েও এক রকমে কেটে যায়। যত-কিছু দুর্দ্দশা এবং সেটা অত্যন্ত অকরুণ মূর্ত্তি ধরে নাকাল করে কলকাতার বর্ষায়। হ্যাঁ,—সবখানের থেকেও কলকাতার বর্ষাকেই আমার বেশী ভয়। অন্যত্র রাস্তায় এমন নদী সৃষ্টি হয় না। পথে অবশ্য কাদা হয়, পিছলও হয়ে থাকে কিন্তু কথায় কথায় এক-হাঁটু জল দাঁড়ায় না, আর বাড়ীর উঠোনের জলে রান্না ভাঁড়ার বৈঠকখানা—সব একাকার হয়ে যায় না। ট্রাম বাস মোটর অচল হয়ে লাখ লাখ লোককে জুতো-জামা শুদ্ধ নোংরা জলে সাঁতার কাটায় না। এই বসন্ত সন্ধ্যাতেও কলকাতার রীতিক্রমে কোন বাসন্তী পরিবেশ ছিল না, অতি সাধারণ সবদিনকার মতই সাঁজবেলা। পাশের বাড়ীর রান্নাঘরের উনান ধরানোর কেরোসিনের ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত ঘুঁটেগন্ধী বাসন্তী বায়ু মধ্যে মধ্যে প্রচুরতর ধোঁয়ার সঙ্গে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হচ্ছিল। তাদেরই উপরতলায় স্কুলের ফেরত মেয়ে দুটি একটি জীর্ণাবস্থ হার্ম্মোনিয়ম নিয়ে দুজনে দুই সুরে তারস্বরে সঙ্গীত সাধনা করছিলো, শুনে শুনে একান্ত অভ্যস্ত না হলে কখনই ঐ বেসুরো-বেতালার উচ্চৈঃস্বরের গান শুনতে শুনতে অ্যানাটোমী বা কেমিষ্ট্রীর সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হত না।

রাস্তায় মোটর, মোটর-বাস, লরী, রিক্সার একঘেয়ে চলন—ঘণ্টার টিং টিং এবং ছোট বড় মাঝারি বয়সের পথচারীদের হল্লা ও ফেরিওয়ালাদের সুরে বেসুরে নানান জিনিসের ফিরিস্তি এতো আছেই, ওসব কানে ঢুকলে যদি তাদের আমল দেওয়া যায়, তাহলে আর

রাজার রাজ্য চালনা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, কৃপণ সুদ-খোরের সুদ-গোনা সমস্ত বন্ধ রেখে আবহকাল অপেক্ষা করতে হয়, সমুদ্রের সমস্ত ঢেউ-এর ওঠাপড়া বন্ধ হলে স্নান করতে নামবার মত।

কলকাতায় বাস করলে যোগাভ্যাসের কাজ হয়। যোগদর্শনকার পতঞ্জলী বলেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

যাক্ ধান ভানতে শিবের গীত এলো নাকি! কোথায় এই শেষ বসন্তের গুমোট করা সন্ধ্যায় কলকাতার এক পুরোণো গলির ছোট্ট একটা বাড়ীতে খানকয়েক পুরাতন চেয়ার ও একটা টানাওলা টেবিলের সামনে বসে হিসেব কষা, আর কোথায় দার্শনিকের সমুচ্চ মতবাদ। হিসাবে একটুখানি ভুল থেকেই যাচ্চে, ঠিক ক্যালকুলেসান করে জিনিষটাকে দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর দাঁড় করাতে পারছি না। একটা প্রচ্ছন্ন সংশয় থেকেই যায়। নাঃ, আরও ভাল করে রিসার্চ্চ করা দরকার। যদি নিজের একটা ল্যাবরেটোরী থাকতো! এরকম লুকোছাপা করে অন্য কাজের আড়াল দিয়ে অনেক কিছু মিথ্যা রচনা করে এসব কাজ কখন সাক্সেসফুল হয়? অথচ উপায়ও তো নেই।

জানলাটা সামনের দিকে খোলাই ছিল, হঠাৎ সশব্দে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ফের সঙ্গে সঙ্গেই সজোরে খুলে আবার ঝনাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর গল্পের সেই "ঢাকন খোল, নাচন দেখ"-র মতই এই খোলে এই পড়ে। টেবিলের কাগজপত্র এদিকে ওদিকে ফর্ ফর্ করে উড়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো, মায় আমার সেই মিল না হওয়া হিসেবের চোতা কাগজখানাও। ঝড় উঠেছে। বেশ বড় রকমের ঝড়। এতটুকু বোবা গলির ভেতরকার এই ছোট্ট ঘরটুকুতেই যার এতটা দাপাদাপি, বাইরে না জানি সে কি করছে? উঠে গিয়ে জানলার বিদ্রোহী কপাট দুটোকে টানাটানি করে এনে কোনমতে

ছিট্‌কিনিটা আটকে দিলুম। ইতিমধ্যে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুরদাদার ওয়াটার কলারের ফেড-হওয়া এন্‌লার্জ্জখানা হাওয়ার দোলায় দোল খেতে খেতে ধুপ করে দড়ি ছিঁড়ে খসে পড়লো এবং কাঁচভাঙ্গার শব্দ হলো ঝন্‌ঝন্ ঝনাৎ। কি বিপদ! দড়িটা অনেক দিন বদলানো হয়নি, পচে গেছলো নিশ্চয়। কে কি করে, যেটি না হাতে করে করবো তা আর হবে না। অথচ এই অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক অনর্থ—আবিষ্কারের অদ্ভুত উত্তেজনায় সারা দুনিয়াই তখন আমার কাছে ঐ পাশের বাড়ীর রান্নাঘর থেকে ভেসে-আসা ধোঁয়ার মতই ধোঁয়াটে।

খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে জানা গেল। কাল-বৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব সুরু হয়েছে ঐ সঙ্গে। তা না হবেই বা কেন? বসন্তের বাসন্তী সমারোহ আমাদের এই পচা গলিতে না থাকতে পারে, তাই বলে তো আর সে রুদ্র-বৈশাখের রুদ্র-লীলার দাপাদাপির কিছুটা ভোগ না করে রেহাই পেতে পারে না। স্থান যেমনই হোক, কালটা তো ঠিকই আছে।

দরজায় আঘাতের পর প্রচণ্ড করাঘাত চলছিল। হাওয়ার ধাক্কা বলে যতই তাকে উড়িয়ে দিতে চাই, ততই তার উগ্রতা বেড়ে ওঠে। বোধ হয় কোন ঝড়ে-পড়া জলে-ভেজা বিপন্ন মানুষই হবে। আমারই কোন বন্ধু বা আত্মীয়ও তো হতে পারে। দরজা খুলতেই কেউ এক-জন ছুটে এসে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো, আর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কোথাকার কোন তার কেটে বা অমনি কিছু একটা বিপত্তি ঘটে আমার ঘরের ইলেক্‌ট্রিক আলোটা ফিউস্‌ড্ হয়ে গেল। এ বড় মন্দ মুস্কিল তো নয়! এখন আমি করি কি? সিগারেট ফুঁকি না, দিয়া-শলাই এ ঘরে দুষ্প্রাপ্য, এক সেই রান্নাঘরের কাজের জন্যে যদি ওদিকে থাকে। সেখানে এখন যাবার যো কি, যে প্রচণ্ড ধারায় বৃষ্টি চলছে,

খোলা দালান উঠোন পার হতে হতে ভিজে বেড়ালেরও অধম হয়ে যাব যে। নিরুপায়ে বিপন্নভাবে প্রশ্ন করলেম, “কে ?”

যে এসেছিল দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিতে দিতে উত্তর করলে, “আপনার ঘরে টর্চ্চ আছে ?”

ঠিক কথা, টর্চ্চ একটা আছে, কিন্তু কোথায় আছে ? টেবিলের উপর, না ওর ড্রয়ারটার মধ্যে ? আছে, না আমার বিশ্বাসী চাকরটার শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে যেমন অনেক কিছুই উধাও হয়ে যায়, তাই গেছে, তাও তো জানিনে। বললেম, “থাকলেও থাকতে পারে, তবে খুঁজে বার করি কি করে ? আপনি কে ? এমন করে এসেই বা ঢুকলেন কেন ?”

বাইরের ঘনঘোর দুর্য্যোগের নিকষ কালিমায় নিরালোক গৃহের অন্ধকার নিরন্ধ্র ও জমাট বেঁধে গেছলো, এতটুকু অস্পষ্ট আলোর রেখা কোথাও দিয়ে চোখে পড়ে না, সেই কঠিন পাথরের গুহার মত অন্ধকার কক্ষে একটা অদ্ভুত হাসির শব্দ একটিবারের জন্য হা হা করে বেজে উঠলো, অপরিচিত কণ্ঠের স্বর পরক্ষণে ভেসে এলো—“পিরামিড বিষ হেমলকের যে প্রতিষেধক নিয়ে আপনি এক্সপেরিমেণ্ট করছেন, এ-ঘরে নিশ্চয়ই তা আছে ? আমায় শীগ্‌গির দিন, শীগ্‌গির।”

অনুজ্ঞাব্যঞ্জক সুদৃঢ় কণ্ঠস্বর।

গভীর বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে বলে উঠলেম, “পিরামিড বিষ! কে বললে এ-কথা আপনাকে ?”

আবার সেই হাসিই উত্তর দিল, “কে বললে, সে কাহিনী বলতে গেলে বলা হয়ত শেষ হলেও হ'তে পারে, কিন্তু আপনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেণ্টের এই সুবর্ণ সুযোগ হঠাৎ আর পাবেন না স্যার। রিসার্চারের ভাগ্যে এতবড় সুযোগ কদাচিৎ মেলে, তাই নয় কি ? অস্বীকার করতে পারেন কি এ-কথা ?”

সীমাহারা বিস্ময়ের সঙ্গে সমান ওজনের আতঙ্ক মিশ্রিত হলো। মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—"সে কি, ওই দুষ্প্রাপ্য মিশরীয় সর্পবিষ আপনি খেয়েছেন নাকি? পেলেন কোথায়? ওর নাম হেমলক তাই বা জানলেন কি করে? এতো একজন মৃত ব্যক্তির মনগড়া কাল্পনিক উপাধি।"

আবারও সেই উচ্চ হাস্য—এবার তার ধ্বনি তীক্ষ্ণ এবং তীব্রতর, —"ফের ঐ রকম অ-বৈজ্ঞানিক কৌতূহল! আপনি জানেন ঐ বিষ-ক্রিয়ার মেয়াদ মাত্র আধঘণ্টা। আমার শরীরে এক কোয়ার্টার আন্দাজ পূর্ব্বে বিষ ঢুকেছে, আগুন জ্বলছে,—দেহযন্ত্র পুড়িয়ে দিতে মাত্র পনের মিনিট সময় আর বাকি। যদি ওষুধ না পাই শুধু মরবো না, আপনাকে এই রিভলবারের গুলিতে শেষ করে দিয়ে তবেই আপনার অনুসরণ করবো।"

টর্চ্চের তীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গে জলঝরা সুদীর্ঘাকৃতি চড়চড়ে ফর্সা রংএর সুপরিচ্ছদধারী যুবক, বাঁ হাতে তার রিভলবার, —একান্তই নাটকীয় দৃশ্য।

আমার টর্চ্চটাও সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে চুরি যায়নি, টেবিলের উপরেই ছিল, ওষুধটা তো সর্ব্বদা হাতের কাছেই রাখি, ঐ অধুনা-বিস্মৃত মিশরীয় বিষের একান্ত দুষ্প্রাপ্য প্রতিষেধকটি মিশর ভ্রমণে গিয়ে নেহাৎই দৈব কৃপায় সেখ সাতুল্লার অযাচিত কৃপায় অবিশ্বাস্য-ভাবে লাভ করে পর্য্যন্ত তাই নিয়েই তো আমি এই গবেষণা করে যাচ্ছি এবং সেই তীব্র বিষের সঙ্গে পটাসিয়াম সায়নাইডের একটা মিল খুঁজে পেয়ে তারই উপর আমার এই প্রাণান্তপণের অনুসন্ধান তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছি। হার্টের উপর অত্যন্ত জোরে এসে যে কোন মহা-গরল অতি তীব্র আঘাত হেনে থাকে সেগুলি সমশ্রেণীর—এই নীতি ধরে কাজ করে চলেছি। ঐ বিষটির নাম নাকি হেমলক। এই

কথা সেই শিশবীয় সেখই বলেছিলেন। আলো জ্বলতেই আগন্তুক তরিৎপদে এসে আমার একমাত্র পুরাতন ইজিচেয়ারখানা দখল করে শুয়ে পড়লো। দেখা গেল পা তার থরথর করে কাঁপছে। হাঁ করে একটা উদ্ধশ্বাস টেনে নিয়ে বলে উঠলো, "শীগ্গির করো,—ঠাণ্ডা বরফ হয়ে রক্ত জমে আসছে, আগুনের বদলে বরফ,—হাঃ হাঃ হাঃ !"

যথাসম্ভব শীঘ্রই গ্লাসে জল ঢেলে তাতে তিন ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দিলাম। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে ধীরে ধীরে চোখ বুজলো।

আমি টর্চ্চের সাহায্যে আমার রিষ্টব্যাণ্ডে বাঁধা ঘড়িটা মুহুর্মুহুঃ দেখে চলেছি। দুই তিন করে পনের ষোল আঠার কুড়ি মিনিট গত হয়ে গেল। অদ্ভুত আগন্তুকের শরীরে কোন রকম সাড়া নেই, একেবারে নীরব নিথর। কি হ'ল ! মরে গেল নাকি ? ভয়ে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তাই যদি হয়ই, উঃ ! কি মহা বিপদেই না আমি জড়িয়ে পড়বো। অনেকে জানে আমি কোন ওষুধ বার করবার চেষ্টা করছি। কিসের ওষুধ নাই জানলো, এই অপরিচিতের শরীরে অজ্ঞাত বিষক্রিয়ার পবিচয় আবিষ্কৃত হলে কে না মনে করবে —আমিই ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছি। আমি এখন কি করি ? উপায় কিছুই চারদিকে হাতড়ে পাচ্চিনে। পুলিসে খবর দিই ? টেলিফোন তো ঘরেই রয়েছে, সব কথাই তাদের খুলে বলবো। এ ছাড়া আর তো কোন পথই নেই। একবার নাড়ীটা দেখে নিই আগে —একেবারেই শেষ হয়ে গেছে কিনা। প্রাণটা থাকতে থাকতে খবর দিতে পারলে ভাল ছিল। বড্ড ভুল করেছি।. বড্ডই ভুল করেছি এতখানি দেরী করে। মড়া তো ফেলতেই হবে, গোপন তো আব থাকবে না।

মুখের কাছে টর্চ্চের আলো ফেলে নিরীক্ষণ করে দেখলেম, শবের

মুখের মত মুখ। তা শুভ্র বা পাণ্ডু নয়, ঈষৎ পীতাভ নীল। যেন হাল্কা করে কপালময় কে নীল বড়ির ফিকে জলে হলুদ গুলে দিয়েছে। চোখ আধখোলা। মনে হয় দৃষ্টিহীন, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ মনে হ'ল পাওয়া যাচ্চে না, তবে মরেই গেছে! উঃ! কি মহা ফ্যাসাদেই যে ফেললে আমাকে হতভাগা! কে আমার এতবড় শত্রু ছিল? আবারও কব্জি খুঁজে নাড়ী পেলাম না—নাঃ, মরাই ঠিক।

নিকটবর্ত্তী পুলিশ-ষ্টেশনের ফোন নাম্বার গাইড-বুক দেখে খুঁজে নিলেম টর্চ্চ জ্বেলে। এই সর্ব্ব শরীর-মনের খর-কম্পনের মধ্যে দিয়ে এইটুকু করতেই বেশ পাঁচ সাত মিনিট সময় খরচ হয়েও গেল! রিসিভারটা সবে তুলে নিয়ে কম্পিত স্বরকে কোন মতে ফুটিয়ে তুলেছি,—"হ্যালো!"

পিছন থেকে হঠাৎ একটা অস্ফুট স্বর ভেসে এলো, "ষ্টপ!"

স-চমকে টেলিফোন রিসিভারটা ছেড়ে দিতেই সেটা সশব্দে ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। আমি মড়া-কাটা, মড়া-ঘাঁটা মেডিকেল কলেজের মেডেলিষ্ট, সার্জারী পাশ করা ছাত্র, উদীয়মান একজন ডাক্তার, ভূতভয়গ্রস্ত একটা শিশুর মতই চমকিত এবং বলতে কি, আতঙ্কে প্রায় অভিভূত হয়ে উঠে পিছন ফিরে তাকালাম। যার শরীরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জীবনী চিহ্ন খুঁজে পাইনি, কয়েকটি মিনিটের মধ্যেই তার একি অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র পূর্ণ বিস্ফারিত, মড়ার মুখের মত বিবর্ণ ললাটে গণ্ডে ঈষৎ শোণিতোচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট—পুনর্জ্জন্ম একেই বলে, না?

তখন আর কিছুই মনে রইলো না, সুবিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে সমস্ত দেহ মন এক মুহূর্ত্তে সবল ও সরস হয়ে উঠলো, যেমনটি হয় বর্ষাজল পেলে তৃণশস্যদের। বালকের মত আনন্দে প্রায় নৃত্য করে—চিৎকারের মতই একটা ধ্বনি করে উঠলেম—"ইউরেকা! ইউরেকা!"

আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি। পৃথিবীর একটা প্রচণ্ডতম গোপন মারণাস্ত্রকে পরাভূত করে মানব সমাজের মহদুপকার করার একটা সুমহান প্রচেষ্টায় ভগবান আমার হাত দিয়ে এত বড় আবিষ্কার তবে সত্য সত্যই করিয়ে নিয়েছেন? আর যাঁর দেওয়া সেই আরবী লেখা ফরমূলা?' দুহাত জোড় করেই তাঁকে প্রণতি জানালাম, তিনি সেখ সাদুল্লা, সেই অজ্ঞাতকুলশীল মিশরী ফকির।

দুই

হ্যাঁ, এইবার দিব্যেন্দুর কথা আরম্ভ করি। দিব্যেন্দু অনেকদিন নীরব থেকে বোধ করি আমার নীরবতা তার চাইতেও গভীরতর দেখেই অল্প কিছুদিন আগে সেটা ভঙ্গ করেছে।

হঠাৎ একদিন তার সেই কোন্ না-জানা জায়গা থেকে এক পত্র এসে হাজির হলো। কাগজের পাতা ভর্ত্তি বিস্তর অনুযোগ, অর্থাৎ কিনা কেন আমি তাকে ভুলে গেলুম? কি এমন সে অপরাধ করেছে ইত্যাদি বহু গঞ্জনা দিয়েছে, তা'তে ঠিক ঐ সব কথাই—আমিও তো তাকে ফেরত দিতে পারতাম, তা কিন্তু আমি দিলাম না, কি হবে তার অনুযোগগুলি তাকেই প্রত্যর্পণ করে। যখন তার দাবী আমার বন্ধুপ্রেমেরই উপর! এইবা দাবী করে কজন এ পৃথিবীতে? অন্য কারু কি হয় জানিনে, নির্ব্বান্ধব আমি, আমার কাছে সত্যকার হৃদয়বৃত্তির দেনা-পাওনা তো বলতে গেলে কারু সঙ্গেই বড় একটা নেই, অবশ্য কৃত্রিম এবং স্বার্থঘটিত একতরফা দেনা—সে কিছু কিছু সংসারে বাস করলে থেকেই থাকে। শুনেছি, এমন কি পাহাড়ের গুহায় বাস করেও মুনিঋষিরাও সব সময়ে স্বার্থপর সংসারীদের দৈবাৎ-দৃষ্ট হয়ে হাত এড়াতে পেরে ওঠেন না। একবারটি ওদের ওখানে যাবার জন্যে সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ তার কাছ থেকে তো

কতবারই এসেছিল। যেতে যে অনিচ্ছা ছিল তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই সেটা ঘটে ওঠেনি। ঐ যে আবিষ্কারকের চিত্ত, ও আর কোন কিছুতেই যেন আকৃষ্ট হতে চায় না! নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ঝোঁকে নেশায় বুঁদ হয়ে ওরই পিছনে ঘুরে বেড়াতে চায়। মনটা বড্ড নীরস ও কঠোর হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ভাল নয়·।

এ কয়েক বৎসরে আমারও তো আর আগের দিন নেই। সেই পচা গলির বাসিন্দা বিনয় বসু তো সেই ঝড়ের রাতেই নবজন্মে জন্মে গেছে। আশ্চর্য্য আগন্তুকের ভৌতিক আবির্ভাব এবং কি বলি তাকে?—'রেসারেক্‌সান'?—মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান? সে এক অদ্ভুত কাণ্ড তো বটেই—সেই থেকে আমার ভাগ্যদেবতা অকৃপণ হস্তে আমাকে "রূপ" না হোক, "রূপা" এবং "দিশোজহি" যশ প্রচুরতর রূপেই ঢেলে দিয়েছেন ও দিচ্চেন। কাজেই ডক্টর বি. কে. বসু এম. বি. (এক্ষণে এম. ডি., এফ. আর. সি. এস. ইত্যাদি) আজ সেই পচা-বাড়ীর ভাড়াটে নয়, চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রাসাদ ভবনের অধিবাসী। তার নিজের প্রকাণ্ড ল্যাবরেটারীতে পাঁচ-সাতজন ভাল ভাল নামকরা ডাক্তার ও অসংখ্য কর্ম্মচারী খাটছে। স্বদেশেই শুধু নয়, সুদূর প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে নামের সঙ্গে গ্রোস গ্রোস তার অচিন্তনীয় আবিষ্কারের ফল প্যাক হয়ে হয়ে যাত্রা করছে।

—যাক, আপনার কথাকে পাঁচ কাহন করতে চাইনে, ওদের কথাই বলি। দিবু তার ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করে পাঠায় বিস্তর অনুনয় করে, সে সময়ে বিদেশ থেকে কয়েকজন সায়ান্টিষ্ট কলকাতায় এসেছেন, আমার ল্যাবরেটারী দেখতে আসতে ইচ্ছুক, তাই যেতে পারলাম না। অবশ্য যথোচিত ভাবেই বন্ধুর প্রথমজাত নবকুমারকে তার প্রাপ্য পাঠিয়ে দিয়ে কথঞ্চিৎ কর্ত্তব্য পালন করতে ভুলিনি এবং তার জন্যে ফিরতি ডাকে সাভিমান অনুযোগ লাভও

করেছি। মাস কয়েক সব চুপচাপ কেটে যাবার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় একখানা অশ্রুজলে বিকৃত চিঠির মধ্য থেকে জানা গেল, দিব্যেন্দুর দিব্যদর্শন (তার ফটো আমায় ওরা পাঠিয়েছিল) ছেলেটি অকস্মাৎ মারা গেছে। কি হ'য়ে তা' ডাক্তার ধরতে পারেনি, আর পার্ব্বেই বা কখন? মাত্র এক ঘণ্টার চাইতেও কম সময়ে তার অসুখ আরম্ভ ও শেষ হয়ে গেল। সেই খবর পেয়ে একবার যাবার ইচ্ছে জেগেছিল, কিন্তু সেবারও অবসর পেলাম না।

এতদিনে সময় পেয়েছি। দিব্যেন্দুর দ্বিতীয় সন্তান জন্মেছে খবর দিয়ে সে যে চিঠিটা দিয়েছিল, সেটা পড়ে আমার মত সংসারাতীত বৈরাগী মানুষেরও কঠিন চোখ দুটোকে শুকনো রাখা শক্ত। ছোট-খুকি ডলিকে পেয়ে পুত্রশোকাহতা ডলির মা কোথায় একটু শান্ত হবেন, বড়ই সে আশা করেছিল, ফলে কিন্তু ঘটেছে ঠিক বিপরীত। সুন্দর ফুটফুটে সোনার পুতুল কোলে পেয়েই তার সে কি ডুকরে ডুকরে বুক-ফাটা কান্না, সে যেন কানে শোনা যায় না। থেকে থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে যায়, আর জ্ঞান হলেই ভয়ে দু'চোখ ঠিকরে বার করে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর আর্ত্তনাদ করে বলতে থাকে, "তুই কেন এলি মা আমার! এ হতভাগীর কাছে তুই কেন এলি? তোকেও মেরে ফেলবে, বাঁচতে দেবে না,—না দেবে না, আমি জানি দেবে না।"

দিব্যেন্দু লিখেছে, "ডাক্তার আনিয়েছিলুম, ওরা চেঞ্জে যেতে বলে! নার্ভাস্ স'কে হয়েছে, দৃশ্য বদলালে সেরে যাবে, ইলা কিছুতেই এখান থেকে এক পা নড়তে রাজী নয়, বলে, 'আমার কপাল যে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাবে। যদি বা দুটো দিন সবুর করতো, তা'ও করবে না। না যাবো না, আমি যাবো না।' কি করি বলতে পারো?

আর নয়! সুখের দিনের সাদর নিমন্ত্রণ তার আমি নিইনি কিন্তু এতবড় দুঃখের দিনের প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারলাম না। এখানকার ব্যবস্থা এক রকম করে দিয়ে ওদের কাছে রওয়ানা হলেম।

তিন

মানুষের কপালে সুখ নেই, এ কথাটা শাস্ত্রকারদের আমি মানি অন্তরের সঙ্গেই। যদি বা কোন সন্দেহ থেকে থাকে দিব্যেন্দুর বাড়ী পৌঁছে সেটুকুও দূর হলো। সে কি একটা বাড়ী! যেন একজন স্বাধীন রাজার রাজপ্রাসাদ। কতখানি জমি নিয়ে চৌরস করে তার চারদিকে চার-মানুষ ভোর বিরাট পাঁচিল-ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় লোহার সূক্ষ্মাগ্র ফলকের বেষ্টনী, চোরের বাবারাও একে টপকে আসতে পারবে না। সামনে মস্তবড় গম্বুজওয়ালা তোরণ। দুদিকে একটি করে দরোয়ানের ঘর। দু'জন করে গুর্খা সিপাই রাত্রি-দিন বন্দুক-ঘাড়ে পাহারা দিচ্চে, কোমরের চওড়া চামড়ার বেল্টে যথারীতি চামড়ার কেসে তাদের জাতি-বাচক তীক্ষ্ণধার শাণিত কুকরী আছেই।

ষ্টেশন থেকে নেমে স্থলপথে যাবার সুবিধা নেই, ওদের প্রমোদ-তরণী বা ক্ষুদ্র মোটর-বোট "ইলাবর্ত্ত" আমার জন্য নদীর ওপর প্রতীক্ষা করছিল। নদী? না নদী ঠিক নয়। সেটা নাকি নদী থেকে পাঁচ সাত মাইল উপরের দিকে বেরিয়ে আসা নদীর একটা খাঁড়ি। তাহলেও জলের তাতে কখনও অভাব হয়নি, অথৈ জলে গ্রীষ্মবর্ষা টলমল করছে। দু'ধারে বন-করম্চা থোকা থোকা হয়ে ফলে আছে, কতকগুলো লাল, কতকগুলো গোলাপী। কদমফুল, কামরাঙ্গা, পালতে-মাদার আরও কত কি চেনা-অচেনা গাছ ফলে-ফুলে তাদের আরণ্যক বাগান সাজিয়েছে। বাড়ীর চারদিক বেড়ে

নিপুণ চিত্রকরের হাতের আঁকা চিত্রের মত সুরচিত একটি চমৎকার ফুল-বাগান। দেশে-বিদেশে এমন ফুল এমন লতা কমই আছে যা' এই বাগানটিতে নেই। নেই শুধু আম, তাল, তমাল, পনস, নারিকেল, সুপারি, কদম্ব, বকুল প্রভৃতি বড় গাছ একটিও। মাঝমধ্য-খানে একটি মার্ব্বেলের ফোয়ারা, সাধারণতঃ অর্দ্ধ-বিবসনা পরীমূর্ত্তিরাই এই সব জলদেবতার তরফে বারিবাহিনী হয়ে থাকে। এখানে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। পাথর কেটে তৈরি-করা পদ্মের উপর পদ্মাসনা উপবিষ্টা, দু'পাশ থেকে দুটি শ্বেত-হস্তী তাঁর মাথায় জল ঢালছে। পরিকল্পনায় ওরিজিন্যালিটি আছে। ও মানুষটা বরাবরই বেশ একটু ভাবপ্রবণ, রুচিটাও ওর বরাবরই সুরুচি।

সন্ধ্যা হয়, দৌড়দার সিঁড়ি কয়টা অতিক্রম করে সামনের লম্বা-চৌড়া দালানে উঠে হ্যাট-ষ্ট্যাণ্ডে হ্যাট রেখে ওর নির্দ্দেশ মত বাঁহাতি ছোট টেবিল-ঘেরা চেয়ার শ্রেণীর মধ্যের একটায় বসে পড়তেই অনতিবিলম্বে উর্দ্দি-পরা 'বয়'শ্রেণীর ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম ও খাবারের ডিস বহন করে এনে রাখলে। দু'জনকার মত ব্যবস্থা! দেখে একটু বিস্ময়বোধ করতে বাধ্য হলেম, এই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুবেশা-সুন্দরী একটি গৃহকর্ত্রীর আবির্ভাব স্বতঃই কল্পনালোকে উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে পারেনি। আশ্চর্য্য! আমাদের চা-পর্ব্বের আগাগোড়া শেষ হয়ে গেলেও সেই ঈপ্সিতাকে দেখা গেল না।

দিব্যেন্দু হয়ত আমার মানসিক বিস্ময় অনুভব করেই ক্ষমা প্রার্থনার হিসাবে ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গেই নিম্নস্বরে বললে, "আমার স্ত্রীর শরীরটা ভাল নেই, তাই তিনি আসতে পারলেন না, তুমি হয়ত তাঁকে ক্ষমা করবে।"

সৌজন্য সহকারেই জবাব দিলেম, "নিশ্চয়ই ক্ষমা করবো। বিশেষ যখন আমি একজন ডাক্তার।"

দিব্যেন্দু হাসল, এতক্ষণের মধ্যে এই তার মুখে একটু হাসি দেখলেম, অথচ এই সেই দিবু, যে একদণ্ড না হেসে আর পরকে না হাসিয়ে থাকতেই পারতো না!

বললে, "তাও আবার একটা বাজে ডাক্তার নয়। মহৌষধি আবিষ্কারক মহর্ষিস্থানীয় মহদাশয় মহান্ ব্যক্তি!

"কি যে তুই বলিস্! ঐটুকুতেই 'মহর্ষি' বনে গেলাম? ঋষি সম্বন্ধে কল্পনার দৌড় ত দেখছি তোর সুবিধের নয়। কথায় বলে, 'মোল্লার দৌড় মসজিদের দরজা পর্য্যন্ত'।"

দুজনেই একত্রে হেসে উঠলাম, এবার বোধ হল সে যেন একটু প্রাণখোলা হাসিই হাসল, যেন বহু-বিস্মৃত অতীত দিনের যৌবন-স্বপ্নের রঙ্গীন ছায়া তার মুষড়ে-পড়া মনটাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ততঃ পুরনো রং ফিরিয়ে দিল। তারপর দুজনে সেই অতীত কালেই হঠাৎ পশ্চাদ্‌বর্ত্তন করলেম। আমার মানব-চিত্তের সাইকোলজি-ঘাঁটা মন সেই ক্ষণেই তার মানসিক ডিপ্রেসনের মহৌষধি আবিষ্কার করে ফেলেছিল। বর্ত্তমানকে যতটা সম্ভব চাপা দিয়ে পুরাতনকে জাগাতে পারলে এই অতি সৌভাগ্যে দুর্ভাগা (জানি না আমার এ কল্পনাটা সত্য কিনা!) বাল্যবন্ধুটির অকাল-বার্দ্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়া দেহ-মনকে হয়ত কিছুমাত্রায় তাজা করে দিয়ে যেতে পারবো। বর্ত্তমান যে কোন কারণেই হোক তার সুখের বা শান্তির নয়।

আর তার স্ত্রীই যে সেই অজ্ঞাত অশান্তির উৎস, তাতেও সেই ক্ষণেই আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে গেল।

চার

কিন্তু পরের দিন সকাল বেলায় খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে উঠতেই খোলা জানলা দিয়ে দিবুর দিব্যোদ্যান যখন আমায় সাগ্রহে আহ্বান

জানালো এবং আমিও সানন্দে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নেমে এলেম, তখন সর্ব্বপ্রথম যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটলো, তাকে দেখে গত সন্ধ্যার দৃঢ়প্রত্যয় আমার শিথিল না হয়েই পারলো না। পরিণত যৌবনে এমন অটুট রূপ বাঙ্গালী-ঘরের মেয়েদের বেশী দেখিনি। নিখুঁত ভাস্কর্য্য'-প্রতিমা, যেন একখানি সচলা দেবী-মূর্ত্তি! ইনিই দিব্যেন্দুর স্ত্রী। মুখখানি ঈষৎ ম্লান, পাতলা ঠোঁটের কোণায় কোণায় ক্ষীণ একটুখানি ক্লান্ত হাসি। তবুও তার সেই পরিম্লান মুখে দৃষ্টি-পাত করলে একটা উচ্চাঙ্গের অনুভূতি স্বতঃই মনের ভিতর জেগে ওঠে। এ মেয়ে নাকি তার স্বামীর জীবনকে অসুস্থ করতে পারে? তবে হ্যাঁ, সেই যে চিঠিতে লিখেছিল, পুত্র-শোকাতুরার মানসিক বিপর্য্যয়ের কথা, সেইটেই হয়ত এদের অব্যাহত সুখের উজানে ক্ষণিকের ভাঁটার টান এনে দিয়েছে।

ইলার গলার স্বরটি পর্য্যন্ত যেমনই মিষ্টি, তেমনি শান্ত। বললে, "কাল আপনি এলেন, আমার এমনি দুর্ভাগ্য আমি আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতেও পারলাম না। আমায় ক্ষমা করুন।"

ব্যস্ত হয়ে বল্লেম, "সে কি কথা! ক্ষমা কিসের? আপনার শরীর সুস্থ ছিল না, তা'তে কি হয়েছে? আমায় একান্ত বাইরের লোক বলে ভাববেন না; দেখাশোনা না থাকলেও আমরা সেই বরাবরের বাল্যবন্ধু দুজনে দুজনার ভাইয়ের মতই।"

মনে হলো ইলার বিষণ্ণ-করুণ মুখখানি আমার এই কথায় ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে যেন সেইক্ষণেই আমায় তাদের একজন আত্মীয় বলেই গ্রহণ করলে। না-জানি কি রকম লোকটা এলো, ভেবে হয়ত একটু ভয়ই পেয়েছিল সে।

এরপর থেকে আস্তে আস্তে সে আমার ছোট বোনটির মতই হয়ে উঠ্‌লো, আমি যাকে বহুদিন পূর্ব্বেই হারিয়েছি।

একটা জিনিষ আমায় খুব বিস্মিত করেছিল, সেটা এই বাড়ীতে ইলেকট্রিকের প্রচুর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একটি রাত্রেও আলো না জ্বলা। প্রথম প্রথম ভেবেছি বিগড়ে গেছে, মেরামত হলেই জ্বলবে। ক্রমে এক হপ্তা কেটে যেতেও যখন কোন ব্যবস্থাই দেখলেম না তখন দিব্যেন্দুকে প্রশ্ন করে বসলেম, "তোমার পাওয়ার হাউসে হ'ল কি ? সারা বাড়ীতে একশো-দেড়শো ইলেকট্রিক বাল্‌ব ঝুল্‌ছে, সাত-ডেলে ঝাড়, বিচিত্র ফানুস-ঢাকনী, ও-সব কি শুধু দেখবার জন্যে ?"

দিব্যেন্দুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। একটা উদ্‌গত নিশ্বাস চেপে ফেলে ও উত্তর দিলে, "ভূতের উপদ্রব !"

"ভূতের ?"

"তা ছাড়া আর কি বল্‌বো ? খোকাটার মৃত্যুর আগের রাত থেকে তুমি আসবার আগের দিন পর্য্যন্ত হাজার বারেরও বেশী চেষ্টা করেও ইলেকট্রিক-ব্যবস্থা ঠিক রাখতে পারিনি। এর জন্যে বড় বড় এক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার বার বার এনেছি, নিজের ত কথাই নেই। পাওয়ার-হাউসে ডবল তালা, গুর্খা সিপাই পাহারা সমস্ত করেছি। কি করে কি হয় কেউ জানে না, প্রতি রাত্রে যন্ত্র বিগড়ানো, 'কনেক-সান কাট' হবেই। একটি দিনও বাদ পড়বে না, বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিয়েছি।"

কাণ্ডটি ভৌতিক বই কি ! প্রকাণ্ড জমির দক্ষিণ-ধারে কতক-গুলো আউট-হাউস দেখা যায়, বেশ বুঝতে পারা যায় যে, বাড়ীর ঐ অংশটুকুমাত্র পুরাকালের চিহ্ন স্বরূপ খাড়া আছে, অবশ্য নূতন রং-চং মেরামতির মধ্য দিয়ে হঠাৎ একটা কৌতূহল মনে জাগলো। বললাম, "চল তো একবার দেখে আসি।" দুজনেই উঠে দাঁড়ালাম, দিব্যেন্দু একটুখানি হেসে বল্লে, "কি মতলব ? ভূতের রোজা, না ডিটেকটিভ ?

উত্তর দিলেম, "স্রেফ কৌতূহল।"

লাল কাঁকর ফেলা ত্বরমুস করা উদ্যান-পথ, দুধারে রাঙা ইটের ঢেউ তোলানর পরে দুধারে সমানভাবে ছাঁটাই-করা বর্ডার গাছ। দুপাশের চৌকা ফ্লাওয়ার বেডে নানা জাতের ফুল গাছ। যথোপযুক্ত স্থানে লোহার থামের মাথায় লোহার তারের জালির উপর দিয়ে লতিয়ে দেওয়া অপূর্ব্ব সব লতাকুঞ্জ। সবুজ ভেলভেট-মোড়ার মত নরম ঘাসে-ঢাকা বিস্তীর্ণ ভূমিতে ঝোঁপের ভাবে তৈরী করা কেতকী এবং নানা বর্ণের ক্যানাজাতীয় ফুলের গাছ ঘেরা সুরচিত ক্রীড়াভূমি। সে সমস্ত অতিক্রম করে আমরা অবশেষে বাড়ীর শেষপ্রান্তে সেই পূর্ব্ব কথিত পাওয়ার-হাউসের সামনে উপস্থিত হলেম। বড় বড় দু-দুটো তালা সত্যই ফটকের মতন সুদৃঢ় নিরেট লোহার দরজায় ঝুলছে, তারও বাইরে লোহার কোলাপ্‌সিবিল্‌ গেট, তা'তেও দুটো তালা। অবাক হয়ে চেয়ে থেকে অবশেষে প্রশ্ন করলেম, "কতদিন এই নতুন গেটটা হয়েছে, নতুনই তো দেখছি। এটা বেশী দিনের ত নয়।"

দিব্যেন্দু উত্তর করলে, "নয়ই তো। ডলি জন্মাবার পর এটা করিয়েছি। খোকার মৃত্যুর রাত্রে,—" একটুক্ষণ থেমে গিয়ে যেন জোর করেই এক নিশ্বাসে বলে গেল,—"জানো, সে-রাত্রে, হঠাৎ সমস্ত বাড়ী গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল! তার শেষ-মুহূর্ত্তে আমরা তার মুখে একফোঁটা ওষুধ, একটু জলবিন্দু দিতে পারিনি। তার শেষ চোখ-চাওয়া মুখ, জীবিত মূর্ত্তি দেখতে পাইনি।" দিব্যেন্দু ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। "সেই থেকে এই অন্ধকারের খেলা আরম্ভ হলো, প্রায়ই হয়, তবে আমিও অন্য ব্যবস্থা করে কতকটা তৈরী হয়েছি, ডলির জন্ম-রাত্রেও ঠিক ঐ একই ব্যাপার! সবটা না হ'লেও কিছুটা অসুবিধে হলো বৈকি। বিশেষতঃ ইলা ভীষণ ভয় পেতে লাগলো, মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা। আর অনবরত কান্না এই বলে যে,

'যে আসছে ওকে নিয়েই আমায় এই সময় চলে যেতে দাও, ও থাকতে পাবে না, ওকে থাকতে দেবে না।' সেই থেকে ওই যে ক্লি ওর বাতিক হয়ে গেল, মেয়েটাকে তো চাঁদ-সূযির মুখ আজ পর্য্যন্ত দেখতে দিলে না। বাড়ীর ঠিক মাঝখানের ঘরে সে থাকে, ওঁর কে দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়া কোথায় ছিলেন, তাঁকে আনিয়েছেন; ভাল নার্স আনালুম, তাকে বেবীর নার্সারীর ত্রি-সীমানায় ঢুকতে দিলেন না। ঝি-চাকরদের কারুকে ওর ঘরে যেতে দেয় না, শুধু আমার বাপের আমলের বুড়ো রাখুদা দুধ দুয়ে দেয়, জল এনে দেয়, যেটুকু নেহাৎ দরকার ঐ করে, আর ওঁরা দুজন।"

কি আর বলি? সন্তানহারা মেয়েদের মস্তিষ্ক বিকৃতির অনেক বিবরণী ডাক্তারী নজীরে পাওয়া যায়, এ'ও তারই মধ্যে আর একটা। আহা অভাগিনী মা! এত সুখ ঐশ্বর্য্য সবই ওর এই মৃত্যু-ফোবিয়ায় ব্যর্থ হ'তে বসেছে। দিব্যেন্দু অবশ্য আদর্শ স্বামী ও মানুষ, কিন্তু সেও মানুষ বই আর তো অমানুষিক কিছু নয়। সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

দিব্যেন্দু পকেট থেকে একটা মোটা চাবির রিং বার করে বড় বড় ভারী ভারী তালাগুলো খুলতে খুলতে বলতে লাগলো—"জানো ডাক্তার! কাল তুমি যখন এলে, ইলা তোমার সঙ্গে দেখা করতে নীচে নামলো না দেখে তোমায় যে বললুম, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ,'—সে স্রেফ মিছে কথা। আসল কথা, সন্ধ্যার দিকে সে তার খুকিকে ছেড়ে একটি পাও নড়ে না, তা' সে যতই কেননা যাই হোক। রাত্রে ঐ ঘরেই তার খাবার যাবে, ঐ ঘরে সে শোবে, তাও ভিতর থেকে প্রত্যেক দরজায় চাবিতালা লাগিয়ে। সে চাবি নিজে না হলে মিসেস্ পাকড়াসী স্বহস্তে বন্ধ করবেন। চাবি থাকে ওঁর আঁচলের রিংয়ে।"

সুগভীর একটা শ্বাস মোচন করে সে বললো, "এমন করে দিনের পর দিন বেঁচে থাকা যায়? এঁ্যা! আর ঐ যে জীবটা তার জন্মান্তরের কত মহাপাতকের ফলেই না জানি কে আমার ঘরে জন্মেছে, ওটার পক্ষে এ কি হচ্চে, বল তো? দেড় বছরের হ'তে যায়, না পারে ভাঁল করে চলতে, না শিখেছে ভাল করে কথা কইতে, হাসি কি স্ফূর্ত্তি ও'তো জানেই না। 'রিকেটি' হয়ে যাচ্চে বন্দী জীবনে থেকে থেকে। ওর মায়ের অত্যধিক স্নেহাতঙ্কই শেষ পর্য্যন্ত ওকে শেষ না করে ছাড়বে না, নিজেও শেষ হবে।"

নাঃ, পাওয়ার-হাউসের মধ্যে কোন সন্দিগ্ধ পরিবেশ দৃষ্ট হলো না। সে যেন সেই পুরাকাহিনীর লখিন্দরের লোহার বাসর-ঘর। কালনাগিনী কোন সূত্রে এর ভিতর প্রবিষ্ট হয়, সে সত্যই মহা রহস্য। ভূত অবশ্য মানি না, বিশেষতঃ সায়ান্টিফিক ভূত। কিন্তু তা' ভিন্ন কি বলাই বা যায় এক্ষেত্রে? সমস্ত দেওয়ালে ঘা মেরে মেরে ঘরের মেজেয় বড় বড় হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে দেখা আগেই হ'য়েছিল, আমিও যেটুকু সম্ভব আবার দেখলাম, নিরেট কঠিন গাঁথুনি, একটু চূণবালি খসলো না। বাহিরে এসে চারপাশে দেখা হলো, বাড়ীর বেষ্টনী প্রাচীর থেকে অন্ততঃ একশো গজ দূরে এ ঘর। আশে-পাশে কোথাও কোন বড় গাছ নেই, সেকথা আগেই বলেছি। প্রথমটা একটু বিস্মিত হয়েছিলেম, এতবড় জমির মধ্যে ফলের গাছ নেই এটা আশ্চর্য্য! এক সময় হয়ত ছিল, কেটে ফেলে পাঁচিল থেকে বেশ অনেকখানি বাদ দিয়ে নূতন নূতন কলমের চারা বসানো হয়েছে, যাদের ফলবান হয়ে উঠতে যুগান্তর এসে যাবে। তাহলে এর এইই কারণ? পরে শুনলাম এই কাণ্ডটি নাকি করিয়েছেন খুকীর মা ইলা দেবীই। বাগানের সমস্ত নামজাদা আম জাম কাঁটাল জামরুল গোলাপ-জাম এমন কি, নারকোল গাছগুলোকেও তিনি বেঁচে

থাকতে দেননি! নিজে অফলা হবার আক্রোশে ওদের ফলবন্ত মূর্ত্তি হয়ত তাঁর অপ্রকৃতিস্থ চিত্তকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল, নয় কি? একেই বলে "স্ত্রীয়শ্চরিত্রম্"—সেই সঙ্গেই মনে হলো, "পুরুষস্য ভাগ্যং"ও যে দেবতার অদৃশ্য প্রবাদবাণী এ-ও কিছুমাত্র বেঠিক নয়। এরও উদাহরণ আমাদের এই সর্ব্বসুখের অধিকারী হয়েও একান্ত দুর্ভাগ্য দিব্যেন্দু।—যাক্ ভাগ্যিস বিয়ে করিনি, খুব বেঁচে গেছি বহু ঝামেলা থেকে। মেয়েদের নিয়ে ঘর করা আর আগুন নিয়ে খেলা, ও দেখছি একই কথা।

পাঁচ

"স্ত্রীয়শ্চরিত্রম্" যে কি বস্তু তখনও তা' ভাল করে জানতে পারিনি। সেটার একটা উদাহরণ পেলেম ঠিক এর পরের রাত্রে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চাঁদের উপর একখানা হিম-কুয়াসার পাতলা চাদরের আচ্ছাদন পড়া সত্ত্বেও বাগানে আলোর অপ্রতুলতা হয়নি। আমার শোবার ঘরটা ছিল ঠিক পিছন দিকের সারিতে, ঐ দিকে কেয়াবন, ঝুমুকোলতা এবং কলকে ফুলের কুঞ্জগুলো বেশ সুস্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াতেই নীচের দিক থেকে মানুষের গলার সাড়া পেলেম। রাত তখন পৌনে দুটো। জল খেয়ে ঘড়ি দেখে ফের শুতে যাচ্ছিলাম, জ্যোস্নাস্নাত উদ্যানের রূপ যেন আমাকে টেনে রাখলে। কানে ভেসে এলো একান্ত অপ্রত্যাশিত শব্দটা :

"তুমি কি বোঝ না এমন করে তোমায় এ বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া আমার পক্ষে কত বড় সাঙ্ঘাতিক? কেন তুমি আস? আরও কি তুমি করতে চাও?"

সমস্ত শরীর মন শিউরে উঠে যেন এতটুকু হয়ে গেল! এ' কি!

এ'যে মনে হচ্ছে ইলার গলার স্বর। দিব্যেন্দুর স্ত্রীর। কিন্তু অপর ব্যক্তি যে ওর কথার উত্তর দিলে সে তো দিব্যেন্দু নয়!

"যা' করতে চাই সে তো তুমি জানো, অনর্থক ন্যাকা সাজ্চো কেন? আমার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হয়, ঝাড়ে বংশে সব্বাই শেষ হবে এ-ও জেনে রেখো এবং তার জন্যে প্রস্তুত থেকো, তোমায় আর সাতটি দিন মাত্র সময় দিলাম। এই আমার শেষ নোটীশ।"

কেতকীবনের অন্তরাল থেকে নিশাচর ও নিশাচরীরা কখন কোন দিক দিয়ে চলে গেছে জানতে পারিনি, আমার কানে নিজেরই মাথায় চড়চড় করে রক্ত উঠে ঝম্ ঝম্ শব্দে তাল বাজাচ্ছিল। এ কি শুনলেম? সত্যি শুনেছি, না এসব নাইটমেয়ার মাত্র? স্বপ্নই সম্ভব! কেউ তো কোথাও নেই, ঝিঁঝির অখণ্ড সঙ্গীতই তো শুধু গাছগুলোর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে! মানুষের কণ্ঠ এর মধ্যে থেকে হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গীতে বড় বড় রহস্যময় সংলাপ শুনিয়ে দিয়ে তেমনি সহসা কোথায় বা এক মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেলো। এ-ও কি কখন সম্ভব? না, এ দিব্যেন্দুদের জটিল পরিস্থিতির বিষয়ে অত্যন্ত সহানুভূতির বশে উদ্ভট কল্পনার ফলেই ঐ রকম একটা কাল্পনিক দৃশ্য বা অদৃশ্য অভিনয় মাথার মধ্যেই সৃষ্টি হলো। একটা 'ক্যাফি-অ্যাসপিরিণ' গলাধঃকরণ করে জল খেয়ে বিছনায় ঢুকে শুয়ে পড়লেম। ঘুমটা এসে গেলেই মাথাটা ক্লীয়ার হয়ে যাবে। এ-বাড়ীর যা ব্যবস্থা দেখেছি, তাতে বাইরে থেকে রাত্তির বেলা 'ফোরটীফায়েড' এই বাড়ী বা জেলখানার মধ্যে কোন লোকের আসতে পারা কখনই সম্ভব নয়।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম দিব্যেন্দু তখনও আসেনি, ইলা দেবী সমস্ত খাদ্য-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকেই সর্ব্বপ্রথম তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ণ করেই নিক্ষেপ করলেম। গত রাত্রের

কথা ঘুমভাঙ্গার পর মনে ছিল না ; এঁকে দেখেই সেটা আমার মনে মধ্যে ঈষৎ হুল ফোটালো। মুখের বিষণ্ণ ক্লান্ত ভাবটুকু যা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সে ছাড়া নতুন কোন চিহ্ন দেখতে পেলেম না। আমি আসতেই উনি উঠে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে সুন্দর নিটোল হাত দুখানি যুক্ত করে একটি ছোট্ট নমস্কার জানালেন, ঈষৎ হাস্য ঠোঁটে এনে মিষ্টস্বরে বল্লেন, "যদি কোন রকম অসুবিধা হয় আমায় দয়া করে একটুখানি জানতে দেবেন, আমি বুঝতে পারছি আমার সব কর্ত্তব্য আমি ঠিকমত করতে পারছিনে, তবু যতটুকু সম্ভব ছোট বোন মনে করে করিয়ে নেবেন।"

বেশ দেখা গেল "ছোট বোন" কথাটা বলে ফেলেই উনি কি রকম যেন একটু সচকিত হয়ে গিয়ে শেষ কথা কয়টা যেন টেনে এনে শেষ করলেন।

পুত্রশোকে নার্ভস্ ব্রেকডাউন হয়েছে—কথাবার্ত্তা বেশী কইতেই যেন কষ্ট পান। আহা বেচারী !—

শিষ্টাচার জানাতে আমার পক্ষ থেকে অবশ্য ত্রুটি হলো না, সে না বল্লেও চলে।

সেদিন অনেকখানি ইতস্ততঃ করেও শেষকালটায় একরকম মরিয়া হয়ে উঠে এক নিশ্বাসে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেম, বলে বসলেম,—"ইলা দেবী ! ছোট বোনই যদি হলেন, তাহলে বড় ভাইয়ের একটা আবেদন শুনুন—"

সবিস্ময়ে ইলা দেবী তাঁর ডাগর চোখ দুটি তুলে চাইলেন, একটু যেন ভয় পাওয়া সে দুটি চোখ। সবের মধ্যেই যেন একটা সন্দেহের ভাব। ঐটেই তো ঐ রোগের দস্তুর।

আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, বলে উঠলেম, "দিবুর মেয়েটিকে আমি আজও দেখিনি, অথচ এখানে আসবার সময় কল্পনা

করেছিলেম—একটি ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে এই নিঃসার জীবনটাকে একটু-খানি রাঙিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আপনি জানেন না, আমি বড়দের চাইতে বাচ্চাদেরই বেশী ভালবাসি।”

ইলার সুন্দর মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল, সে একটুক্ষণ নীরব থেকে একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “আমি তাকে আনছি, তবে তাকে দেখে আপনি সুখী হতে পারবেন না। সে মানুষের সন্তান হলেও একটি কাঠের পুতুলের মতন, রং তাতে ফোটেইনি, সে আপনার মনকে কি দিয়ে রাঙাবে।”

আমাদের প্রাতঃরাশ সমাপ্ত হয়ে গেছলো, ইচ্ছা করেই বাইরের দিক থেকে মধ্যের বড় ড্রইংরুমে এসে বসলেম। ইলা দেবী আমার এই বিবেচনা বুদ্ধির সম্ভবতঃ মনে মনে তারিফই করলেন, দেখলেম সেটা প্রকট হয়ে উঠলো তাঁর ঈষৎ প্রসন্ন মুখভাবে।

ইলা দেবীর পাশাপাশি তাঁরই প্রায় সমবয়সের একটি মহিলা দিব্যেন্দুর মেয়েকে কোলে করে ঘরে ঢুকলেন। এঁরই কথা দিব্যেন্দু বোধ করি আমায় বলেছিল, ইলা দেবীর পরিচিতা,—না আত্মীয়া,—না ঐ রকমই কি যেন কি একটা হ’ন।

. মেয়েটি সত্যি সত্যিই একটি রংচটা বড় কাঠের পুতুল! কালীঘাটে আগে যেমন খোদাই করা পুতুল একটি পয়সা দিলেই পাওয়া যেত। সাদা দুধের মত রং, রক্তের যেন তাতে লেশমাত্র নেই, গায়ের চামড়া যেন পার্চমেণ্ট কাগজের মত স্বচ্ছ। শরীরের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা হাড়-পাঁজরা সমস্তই একটি একটি করে গোণা যায় ট্রান্‌স্‌পারেণ্ট কাঁচের গ্লাসের মধ্যে রাখা বাসি এক মুঠো ঝরো-ঝরো জুঁই-ফুল। অভিভাবিকার শিক্ষা মত ইংরেজী-কেতায়—“টাটা” এবং বাংলায় নমস্কার জানালে, গলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর পাখীর বাচ্চার কাকলীর মতই ক্ষীণ ও অস্ফুট।

তথাপি ওরই মধ্যে যে একখানি রূপের পসরা সাজানো রয়েছে সেও দেখতে পেতে বাধে না। ইলারই অনুরূপ পাতলা তুখানি ঠোঁট, কালো ও বিশাল তুটি চোখ, রুক্ষ চুলগুলিতেও সেই একই মৃদু কুঞ্চন, নীল শিরা-বারকরা কপালখানিও ছোট্ট। আমার হঠাৎ কান্ত কবির একটি বড় করুণ লাইন মনে পড়ে গেল :—

"ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে,
অকালে ঝরে গেল, মরমে মরে গেল,
প্রাণ-ভরা আশা সমাধি পাশে।"

কিন্তু কেনই বা তা যাবে? সাগ্রহে বলে ফেললেম, "ইলা দেবী, আপনার মেয়ের চিকিৎসার ভার আমার হাতে দিন, আমি ওকে স্বাভাবিক করে দোব।"

বিত্যুৎস্পৃষ্টের মত তড়াক্ করে চেয়ার থেকে ছিট্‌কে লাফিয়ে উঠে দিব্যেন্দু আমায় জড়িয়ে ধরে গভীর আনন্দে বলে উঠলো, "গ্যারাণ্টি?"

"গ্যারাণ্টি"—

ইলা দেবী সহসা নতজানু হয়ে আমার পায়ের তলায় বসে অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রণাম করলেন, তাঁর তুচোখে জলের ধারা অঝোরে ঝর ঝর করে ঝরে-পড়তে লাগলো।

আমি তাঁর হাত ধরে উঠালেম, সস্নেহে বললেম, "দক্ষিণা পরে নোব বোন।"

মিসেস পাকড়াসী হঠাৎ এই ভাব-তরঙ্গের সমস্ত মাধুর্য্য ধ্বংস করে দিয়ে বলে উঠলেন, "বেবির বেদানার রস খাবার সময় হয়েছে, ওকে আমি নিয়ে যাচ্চি।"

আমি সুস্পষ্ট চমকে চম্‌কে উঠলেম, এই কণ্ঠই যে সেই নিশীথ-রাত্রের নিশাচারিণীর কণ্ঠে শুনেছিলেম, তাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ রইলো না। কিন্তু কেন?—আর সেই অনুজ্ঞাকারী পুরুষটিই বা কে?

ডল্লি খুব সহজেই আমার বশ হয়ে গেলো। তার এক ফোঁটা ছোট্ট জীবনে সেই ভীষণ কড়াক্কড়ি দিয়ে ছকা ডিসিপ্লিনের মধ্যে কিছুই কারুর কাছ থেকে সে এ পর্য্যন্ত ভাল জিনিষ পায়নি তো, স্বাধীন সত্তা ওর মধ্যে জন্মাবে কি করে। মা ওর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারেন না, খোকার শোকের আঘাত ও ভবিষ্যতের আতঙ্কে এই ছাল-ছাড়ানো পাখীর ছানার মতন মেয়েটাকে তিনি ঠিক সইতেই পারছেন না, তা' ওকে দেখবেন কি করে! সে যত্ন অজস্রই পায়, আদর মোটেই পায় না। মিসেস পাকড়াসী সেবাটা খুবই চুটিয়ে করেন, কিন্তু করলে কি হবে, ঐ রকম নীরস গাম্ভীর্য্যে ভরা নীরস মুখের বিরূপ যত্ন-আত্তির অর্থ বোধ করা কচি-বাচ্চার পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

আমি ক্রমশঃই তাকে জালে ফেলে কাছে টানতে লাগলেম। হপ্তা খানেকের মধ্যে সে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেই যেন আমার সঙ্গে গাইতে আরম্ভ করলে, "ভাঙলে আদল"—কখনও আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে—"আহ্নু দালা, আহ্নু দালা,"—

আমি তার সমস্ত রুটিন ভেঙ্গে যখন তখন তাকে নিয়ে বাইরে চলে আসতে লাগলেম। বাগানেও ক্রমশঃ তাকে কোলে নিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে দিলেম। প্রথম দিনটায় আমার এই কাণ্ডে ইলা দেবী তো বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেলেন। মনে হল এক্ষুণি ছুটে এসেই আমার হাত থেকে ছিনিয়ে বুঝি মেয়েকে টেনেই নেবেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেম, তা না করে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করছেন। এমন কি, পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ফেলেন,—সেই ভয়ে একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে হঠাৎ 'আসছি' বলে বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলেন!

অনুকম্পার সঙ্গে সেইদিকে চেয়ে উচ্চারণ করলেম, "আহা বেচারী !" কিন্তু দয়া তাঁকে না করে করলেম তাঁর মেয়েকে। সেও তো আর কম বেচারী নয়, বরং ঢের বেশীই। সমস্ত জীবনটাই তো তার সামনে পড়ে আছে অফলা হয়ে।

খেলনার দোকান তার ঘরে, সে কিন্তু আর সেদিকে ফিরেও চায় না। "আঙ্কাল দাই"—এই হল তার সর্ব্বক্ষণের মুখের বুলি। আমিও তাকে সহজে হাতছাড়া করি না। মিসেস পাকড়াসীর একান্ত ভয় ব্যগ্রতা অস্থির আগ্রহ কিছুকেই আমল না দিয়ে ওঁর "ওয়ার্ডটি"কে যথাশক্তি নিজের হস্তগত করে নিতে লাগলেম। এমন কি দিব্যেন্দু ও ইলা দেবীকে বলে ওর খাওয়ানোর ভারটাও জোর করে নিজের হাতে ছিনিয়ে নিলেম। ফলের রস, মেডিকেটেড ফুড সব বন্ধ করে দিয়ে খাঁটি দুধ ষ্টীমে জল বসিয়ে তাতেই গরম করে এবং নিজের সঙ্গে চারটি করে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করলেম। বেশ বুঝতে পারি ইলা খুব ভয় পায়, কিন্তু এত ভদ্র যে নিজের দেওয়া কথা সে কিছুতেই ভাঙ্গে না। বিবর্ণ মুখে চট করে সেখান থেকে সরে যায়। বেশ দেখতে পেলেম ঐ মেয়েটি "মৃদুনিকুসুমাদপি" হলেও "বজ্রাদপি কঠিনও" বটে ? সত্যের সে পূজারিণী। আমার হাতে মেয়ের সমস্তটা ছেড়ে দেবে কথা দিয়েছে, কথার খেলাপ সে কিছুতেই করবে না। অবশ্য এটাও ঠিক যে ঐ ত্যাগ স্বীকারের প্রত্যক্ষ ফল সে সঙ্গে সঙ্গেই ফলতে দেখতেও তো পাচ্ছিল। এক হপ্তার ভিতরেই কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই না ঐ আধমরা মেয়েটার হয়েছে ! সে এখন কোলে বড় একটা চড়ে না, আমার আঙ্গুল ধরে হেঁটে বেড়ায়। নিজের হাতে প্লেটে ছড়িয়ে দেওয়া শুকনো ভাত, গরম ভাজা খই, বিস্কুটের টুক্‌রো তুলে তুলে খায়। কমলালেবুর কোয়া চোষে, বেদানা চিবোয়, আবার চেঁচিয়ে ডাকে, "আঙ্কাল ! এতো।"

ইলাকে দেখলে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে। ইলা মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েই হঠাৎ কেঁদে ফেলে। মেয়ে অবাক্ হয়ে মায়ের মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে আস্তে আস্তে সান্ত্বনা দেয়,—"কেঁনো না, তুপ কলো, অতুক্ তব্বে, আঙ্কাল বুকৃবে। দত্তি মা! কেঁনো না।"

মিসেস পাকড়াসীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। উনি ওঁর ওয়ার্ডের চার্জ্জ থেকে মুক্তি পেয়ে খুসী না বিরক্ত? ওঁর ওই ভাবাবেগশূন্য পাথরে কোঁদা মুখে কিছুমাত্র তা বোঝবার উপায় নেই।—অদ্ভুত এই নারী।

কিন্তু বোঝবার দিন হঠাৎ একদিন বড় শীঘ্রই আমাদের সামনে এসে পৌঁছে গেল। অন্ধকার রাত্রি, মেঘও খানিকটা আকাশের কোলে কোলে জমে রয়েছে। চাঁদ তো নেই-ই, নক্ষত্রও কদাচিৎ চলমান মেঘের ফাঁকে এক একটা করে দেখা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুমটা ভেঙ্গে গেছলো, বিছানা ছেড়ে উঠেছি, হঠাৎ আমার ঘরের ঠিক নীচে বাগানের সেই কেতকী-কুঞ্জের ওপাশ থেকে মানুষের গলার সাড়া এলো,—সেটা চাপা একটা তর্জ্জন।

"তোমায় সেদিন শেষ নোটিশ দিয়ে গেছি যে ইলার মেয়েকে সাত দিনের মধ্যে যদি খতম করতে না পারো, একসঙ্গে এ বাড়ীর সব্বাই মরবে সেকথা ভুলে নিশ্চয় যাওনি?"

এর উত্তরও শোনা গেল চাপা ক্রোধ ও বিরক্তিতে ভরা—"আচ্ছা একি জুলুম তোমার, নিজে যা করতে পারো করো, আমি একটা স্ত্রীলোক, একদিন ভদ্র ঘরেরই মেয়ে ছিলেম, তোমার ছলনায় ভুলে আজ আমায় একটা ফাঁসুড়ে খুনির স্ত্রী হতে হয়েছে, সে তো একটা জন্মের জন্যে, না না—বহু বহু জন্মের জন্যেই যথেষ্ট, তা'তেও তুমি খুসী নও? ঐ কচি বাচ্ছাটাকে আমায় দিয়ে হত্যা করাবে? তবু তোমার ভয়ে তাকে হাতে না মেরে স্লো-পয়জন তো করছিলামই,

যদি ভগবান তাকে স্বয়ং পিতৃবন্ধুর মূর্ত্তি ধরে এসে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রক্ষা করেন, আমি তার কি করতে পারি ?”

ভূমে প্রচণ্ড পদাঘাতের শব্দ শোনা গেল, “কালকের মধ্যে তুমি তাকে পুরো ডোজ দিয়ে মারবে কি না ? হ্যাঁ কিম্বা না—উত্তর দাও। ধর্ম্মতত্ত্বের বক্তৃতা করতে যেও না। হ্যাঁ, কিম্বা না ? এই শেষ কথা।”

“না”—

“এক্ষুণি মরবে জেনেও ?”

“আঃ, মরলে ত আমি বেঁচেই যাই। যে যন্ত্রণা দিন-রাত ভোগ করছি আমি, মরণ তো আমার পক্ষে ভগবানের পরম আশীর্ব্বাদ।”

“তবে সেই আশীর্ব্বাদই গ্রহণ কর—হতভাগী।”

“যাক স্বামীর হাত থেকে তবু একটা পাবার মত কিছু ভাল জিনিষ এতদিনে পেলুম। অনেক ধন্যবাদ!”

গুড়ম্ গুম্ একটা মাত্র ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। আর কোন প্রতিশব্দ পর্য্যন্ত নয়। মিসেস্ পাকড়াসী তাঁর স্বামীর দান বীরাঙ্গানার মত নির্ব্বিকার চিত্তে নিঃশব্দেই গ্রহণ করে নিলেন বুঝতে পারা গেল।

পিস্তলের আওয়াজে দিব্যেন্দুর চাকর দরোয়ান অনেকেই ছুটতে ছুটতে সেইখানে এসে জড়ো হয়েছিল। ঝিয়েরাও আর্ত্তদৃষ্টি মেলে মেলে এসে দাঁড়াতে লাগলো। আসেন নি শুধু ইলা দেবী। হয়ত ঘুম ভাঙেনি, নয়তো মেয়ে ফেলে আসতে ভরসা করেন নি। আসেন নি সে ভালই করেছেন।

মিসেস্ পাকড়াসীর ঠিক হার্টের উপর রিভলবারের অব্যর্থ গুলি বিঁধেছে। এত কাছ থেকে মারা হয়েছে যে পিস্তলের নল ওর বুকে ঠেকেছিল তার প্রমাণ জামা কাপড়েই রয়েছে। প্রাণ বার হতে মুহূর্ত্তকালও সময় লাগেনি।

পুলিশ না এনে উপায় নেই। লাস চালানও দিতে হলো। ওর জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গেল যাতে করে জানা গেল উনি মিসেস্ পাকড়াসী নন, মিসেস্ হাজরা। কুমুদিনী হাজরা। একটা ছোট্ট কাঁচের শিশিতে সিকিভাগ ভর্ত্তি এক প্রকার সাদা মিহি গুঁড়া পাওয়া গেল, সেটা যে কি ডাক্তারী পরীক্ষাতেও তা' স্থির হলো না। আমি অনেক চেষ্টা করে সেটা আদায় করে রেখে দিলেম। "স্লো-পয়জন" করার কথাটা তো আর ভুলে যাইনি। হয়ত ঐটেই সেই "ফুল ডোজ" যার সামান্য অংশ শরীরে ঢুকে দিব্যেন্দুর মেয়েটি আস্তে আস্তে মরণের মুখে এগিয়ে চলেছিল। ঘোর সন্দেহ হলো জিনিষটা আমার 'হেমলক' নয়তো ?

সব চাইতে বড় সমস্যা এই বাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ বাগানের ভিতর আততায়ী এলো কি করে ? শুধু ঐ একবারই নয়, আমার সাক্ষ্য থেকেই সবাই সেদিন জানতে পারলে—এর পূর্ব্বেও তিনি ঐভাবে এ বাড়ীতে গতায়াত করেছেন। মিসেস্ পাকড়াসীর সহায়তায় ?···হতে পারে। কিন্তু ওকে খুন করে সে কোথা দিয়ে পালালো ? কোন দিকের কোন রন্ধ্র পর্য্যন্ত তো খোলা ছিল না ! কেয়াবন কেটে ফেলা হলো ; কিন্তু ওর তলায় কোথাও কিছুই তো নেই। দিব্যেন্দু যখন এই জায়গাটা কেনে, এটা পরিত্যক্ত একটা নীলকুঠি ছিল। সেই সময়কার সেই ভাঙ্গা বাড়ীটার অবশেষ তারই একটা দিকের ভিতটা এই পর্য্যন্ত ছিল বটে, সেই নিশানাটাই শুধু কেয়া ঝোঁপ সাফ হতে জানতে পারা গেল। বনটা সম্পূর্ণ কেটে শেষ করেও আর তো কিছুই বেরুলো না ! দিবু বললে, বড্ড চারচৌকা ভাবের কুঠিটার গড়ন ছিল বলে এই বাড়ী করবার সময় এই দিকের ভিত্তিটা লাইন ধরে বাদ দিয়েছিল। তিন দিকের ভিত খুঁড়ে ফেলে তার উপর বাড়ীটা করেছে। এদিককার খানিক খানিক বাগানের দরকার হিসাবে রাস্তা

তৈরির ভিতর এসে গিয়েছিল। ঐ দিকটাই শুধু চলনপথে পড়েনি। ইলার সখে এখানেই কেয়াগাছগুলো লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কুমুদিনীর হত্যাকারী সর্প-প্রকৃতির হলেও কলেবরে তো মনুষ্যাকৃতিই, জাত সাপ তো আর নয় যে কেয়াবনের মধ্যের গহ্বরে অদৃশ্য হবে? কোন্ পথে সে গেল? হলো কি তবে? ম্যাজিসিয়ান? সয়তান? প্রেত? যোগসিদ্ধ?—কি সে?

ইলার অবস্থা অবর্ণনীয়। সে যে কি অবস্থা—সে আর বলা যায় না। মুহুর্মুহুঃ সে মূর্চ্ছিত হতে লাগলো। মেয়েটাকে সে না পারে ধরে রাখতে, না পারে ছাড়তে। আমার হাতে রেখেও আর সে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। যখন জ্ঞান হচ্ছে, অর্দ্ধ অভিভূত তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই পড়ে থাকছে, কখনও বিড়বিড় করে কি যেন সব বলছে, কখনও কেঁদে ভাসাচ্ছে, কার কাছে যেন ব্যাকুল হয়ে দয়া প্রার্থনা করছে, সে যে কি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য—সহ্য করাই দায়।

দিব্যেন্দুদের বাড়ীতে এসে যেটুকু ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালিয়ে তুলতে পেরেছিলেম, একটি পিস্তলের গুলির নির্ম্মম ফুৎকারে তা'এক মুহূর্ত্তেই নিভে গেল!

এ কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেম, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং—ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।" এক্ষেত্রে বিধিলিপির কথা না ভেবে তো মানুষের উপায় নেই।

সাত

এ-রকম একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেলে সমস্ত পরিস্থিতি-টাই যে অস্বাভাবিক রকমে উলটে যাবে, সেটা কিছুই বিচিত্র নয়। পুলিশ-হাঙ্গামা, সুদূর সদরে লাস চালান দেওয়া, সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে প্রাণান্তকর টানাটানি, সদর কোর্টে, করোনারের কোর্টে, পুলিশ

থানায় বারম্বার যাতায়াত, যতরকম অস্বস্তিকর ব্যাপার পৃথিবীতে ছড়ানো আছে সমস্তই একত্রিত হলো। আমিই ছিলুম এ কেসের প্রধান সাক্ষী। সেই দুটি রাত্রির নৈশ অভিসারের অদৃশ্য অভিনেতাদের মুখনিঃসৃত বিচিত্র সংলাপের একক শ্রোতা। এ ভিন্ন আর কেউই কোন কিছুই বলতে পারলে না, যাতে করে এই গভীর রহস্যজনক ব্যাপারের অন্ধকারময় কৃষ্ণ-যবনিকা ভেদ করে একটু ক্ষীণতম আলোকরশ্মির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মৃতার জিনিষপত্রের মধ্য থেকে একখানি হিসাবের খাতায় লেখা নামটি পাওয়া গেল, কুমুদিনী হাজরা। ইলাদেবীকে ওঁর হস্তাক্ষর চেনবার জন্য দেখানমাত্র তিনি কাঁপতে কাঁপতে একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করেই মূর্চ্ছিত হয়ে গেলেন। এইটুকু তার থেকে বোঝা গেল, এ হাতের লেখা ঐ "বিন্দুমতী পাকড়াসীর"ই বটে! ওরই মধ্যে আর একটা অর্দ্ধব্যক্ত ধ্বনি আমার কানে এসে আঘাত করেছিল, "পিশাচ! পিশাচ! তুমি নরপিশাচ!" কে সেই নরপিশাচ? পিশাচী বললে না হয় কুমুদিনীকে বোঝাতে পারতো যে, তার মেয়েকে স্লো-পয়জন করে বিশ্বাসহন্ত্রী হয়ে মেরে ফেলতে বসেছিল। 'তুমি' থেকে মনে হলো হত্যাকারী এঁর খুবই অজানা লোক নন। কিন্তু জেরা করে করে কোন ফলই ফললো না। কোন প্রশ্ন করলেই সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধব্যক্ত কান্নানি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না—বরঞ্চ নূতন করে এক একটা দীর্ঘস্থায়ী ফিট হয়ে যায়। এমন করে এ মেয়ে বাঁচবেই বা কতক্ষণ? আর বেঁচেই বা করবে কি এ? অথচ মনে হয়, ইচ্ছা বলে এ অনেক কিছু জানিয়ে দিয়ে প্রতিকার করবার পথ করে দিতে পারতো। কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাণ্ড? কি আশ্চর্য্য রহস্য ওর মধ্যে নিহিত?

আমি ইতিমধ্যে একটা নূতন আবিষ্কার করে ফেলে স্তম্ভিত হয়ে

গিয়েছি। সেই ছোট্ট সরু শিশির গুঁড়োটুকু থেকে এক অণু পরিমিত বস্তু আমার ভোরের বেলার বেড্-টির তলানিটুকু খেতে নিত্য সমাগত (জানলা দিয়ে) কাঠ-বেড়ালীটার বিশ্বস্ত পানীয়-টুকুতে মিশিয়ে দিলেম। পরম পরিতোষে সে চেটেপুটে খেয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল, পরদিন কিন্তু আর ফিরে এলো না বাগানে গিয়ে বেশী খুঁজতে আমায় হলো না ; আমার ঘরের দিকেই যে কাঞ্চন ফুলের গাছটা দিয়ে সে আমার ঘরের জানলায় এসে পৌঁছতো, তারই তলায় তার প্রাণহীন দেহটা গুটিশুটি হয়ে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। মনে একটু কষ্ট যে হয়নি তা' কি বলতে পারি? কিন্তু এ রকম পাপ তো আগে ঢের করেছি, আবার হয়ত এই নিয়ে করতেই হবে।

আরও কম মাত্রায় দিব্যেন্দুর খুব সৌখীন একটা কুকুরকেও ঐ গুঁড়োর একটু কণা দিন তিনেক খাওয়ানোর পর তার ওজন নেওয়ালেম, তিন দিনে প্রায় তিন পাউণ্ড কমে গেছে সে, মরণ দশায় পৌঁছুতে খুবই কম বাকি। বলা বাহুল্য, একটা অজুহাতে ওবে ওজন নিয়ে তবেই এই এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করেছিলেম।

কোন ভুল নেই,—ডলিকে এই দিয়েই শ্লো-পয়জন করা হচ্ছিল,—দিব্যেন্দুর ছেলে এরই দ্বারায় হত হয়েছে।

কুকুরটা আধ হাত সাদা শুকনো জিভ বার করে পড়ে পড়ে ধুঁকছিল, আমার সুপ্রসিদ্ধ সর্প-বিষের প্রতিষেধক জবরদস্তি করে ওকে খাইয়ে দিলাম। দুঘণ্টা পরে দেখতে গেছি, কৃতজ্ঞ জীব লেজ তুলে ছুট্টে এসে আমার গায়ে পায়ে মুখ ঘষে ঘষে—ওঃ! কি পরমানন্দই যে জ্ঞাপন করলে, মানুষেও অমনটি পারে না।

ডলিকে তৎক্ষণাৎ গিয়ে একটা ডোজ অ্যানটি-হেমলক আমি খাইয়ে দিলেম। নিঃসন্দেহে এইবারে ওর সমস্ত জড়ত্ব, আধিব্যাধি

বিদূরিত হয়ে গিয়ে ও মানুষ হয়ে উঠবে। হয়েছে—অবশ্য কতকটা কদিনেই! কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষক্রিয়াও তো কিছুটা থেকে গেছে এখন পর্য্যন্ত,—আর ওই সাংঘাতিক সর্পবিষ!

এই সব নানান হাঙ্গামা চলেছে, দিব্যেন্দু পুনশ্চ সদর থেকে খুব বড় এক্সপার্ট এঁনে ইলেক্‌ট্রিকের বন্দোবস্ত করিয়ে ওর সেই যন্ত্রালয়-টাকেও ইলেক্‌ট্রিফায়েড করিয়ে নিলে। না জেনে যেখান দিয়েই যে কেউ প্রবেশ করতে চেষ্টা করবে তাকেই নিমিষের মধ্যে বিদ্যুতাহত হয়ে মরতেই হবে। সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুতালোকে সমস্ত বাড়ী-বাগান দিনের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে রইলো, হাজার দুহাজার পাঁচহাজার পাওয়ারের আলোয় নৈশোদ্যানের প্রত্যেক অংশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগলো। গোপনীয় বলে কোথাও কিছু আর এর মধ্যে থাকতেই পারলো না।

মধ্যরাত্রে সহসা সমস্ত আলোই এক সঙ্গে নির্ব্বাপিত হয়ে গিয়ে ঘোর অন্ধকারে চারদিক মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার মূর্ত্তি ধারণ করলে। নিঃসন্দিগ্ধ পুরবাসী অন্য সমস্ত আলো বাতি সে রাত্রে একেবারে গুদামজাত করে ফেলেছিল। একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। ক্রমশঃ আলো জ্বালাও দু'একটা করে হতে লাগলো। আমি ও দিব্যেন্দু দুটো টর্চ্চ নিয়ে বাগানে বেরিয়ে পড়েছিলেম। কোন চিহ্ন কোথাও নেই সত্যি, কিন্তু সেই ভূতপূর্ব্ব কেয়াবনের দিক থেকে একটা ভারী জুতাপায়ের শব্দ সুস্পষ্টরূপেই আমাদের দুজনার কানে এসে পৌঁছে-ছিল, তাতে দুজনেই আমরা সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিগ্ধ।

পাওয়ার হাউসে যথারীতি পূর্ব্বানুবৃত্তি হয়ে গেছে। তার সমস্ত যন্ত্রপাতি বিপর্য্যস্ত, এমন অবস্থা যে মেরামত করবার কোন উপায় পর্য্যন্ত আর নেই।

এ কি প্রহেলিকা! সত্য সত্যই ভৌতিক কাণ্ড নাকি?

ঈভিল-স্পিরিটরা নাকি এই রকম সব অত্যাচার করে শুনেছি। কিন্তু তারা 'হেমলকে'র সাহায্য নেয় তাতো কখনও শুনিনি।

আর তা বা কি করে বলা যায়? মিসেস পাকড়াসী তো আর ভৌতিক ন'ন, রক্তমাংসের তৈরী মানবীই যে ছিলেন তার মধ্যে তো আর সংশয় নেই, না হলে গুলি খেয়ে মরলেন কি করে? যে লোকটা তাকে দিব্যেন্দুর সন্তানদের পয়জন করে মারবার জন্যে নিযুক্ত করেছিল, তাহলে সেই বা ভূত হবে কেমন করে, মানুষ না হয়ে? আর ঐ সর্প-বিষেরই বা সহায়তা নেবে কেন সে?

দিব্যেন্দুকে হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করে বসলুম, "আচ্ছা, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়? তাঁদের কে কে এবং কোথায় আছেন? তোমার বিয়েতে আমি তো আসিনি, এ বিষয়ে কিছুই তাই জানিনে।"

দিব্যেন্দু ঈষৎ অপ্রতিভের মত লজ্জিত মুখে জবাব দিলে, "বিয়েটা আমার ভাই ঠিক যথারীতি তো ঘটেনি, তাই কাউকেই জানাতে পারাও যায়নি। ব্যাপারটা একটু রোমান্টিক গোছের হয়েছিল কিনা।"

"তাই নাকি?—কি রকম?"

"অর্থাৎ ঘটক বা অভিভাবকরূপে তৃতীয়পক্ষ এ বিয়েতে কেউ ছিলেন না, স্রেফ বর-কনেকেই ঘটকালী করা থেকে সব কিছুই করতে হয়েছিল।"

"ঠিক বুঝলেম না। কোর্টশিপ করে স্বাধীনভাবেই না হয় বিয়েটা হলো, হিন্দু মতেই তো হয়েছে, না তিন আইনে? অসবর্ণ বিয়ে?"

দিব্যেন্দু বললে, "অসবর্ণও নয়, আবার ঠিকঠাক সবর্ণও হয়ত না হতেও পারে। ইলার সঙ্গে লাহোর যাবার সময় ট্রেনে হঠাৎ দেখা

হয়ে যায়। ওরা রাওলপিণ্ডির অধিবাসী। সঙ্গে ছিলেন ওর মস্ত বড় পাগড়ী-বাঁধা চুড়িদার পায়জামা আচকান-পরা বাবা। যদিও পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বলেই, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় আচার ব্যবহারে তাঁকে কোন মতেই বাঙ্গালী বলা চলে না, এতই তিনি খাঁটি পাঞ্জাবী।"—একটু থেমে বললে, "বুঝতেই পাচ্চো, সে শ্রীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করলে কাকারা কখনই তাঁর কন্যাকে বধূ করে ঘরে আনতে রাজী হতেন না, অগত্যা ওদের পশ্চাদানুবর্ত্তন করে 'পিণ্ডিতে' গিয়ে পুরুত ডেকে যথাশাস্ত্র পাণিগ্রহণ-পর্ব্ব সেরেই একেবারে ওকে বাড়ী নিয়ে ফিরলেম। তা' আমাদের শাস্ত্রেও তো রয়েছে, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,"—কেমন, না? নেই একথা?"

উত্তর দিলেম, "আছে বৈকি! আর তোমার স্ত্রী—'স্ত্রী রত্নই'। বড় দুঃখ হয় এমন মেয়ের জীবন এমন কষ্টের হয়ে গেল।" দিব্যেন্দু একটা সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে।

প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা ওর সেই পগ্যধারী বাপের কি হল? আসে টাসে?"

দিব্যেন্দু যেন শিউরে উঠলো, "ভগবান রক্ষা করুন! সে এলেই তো এর উপর আমি একেবারেই গেছি! ইলা অবশ্য সব কথা জানে না। বাপটিও কি কম সয়তান! আমার মনের ভাব বুঝে নিয়ে আমায় সে-ই প্রলোভিত করে বিয়ের ব্যবস্থা করলে; যেই সব পাকা হয়ে গেল তখন বলে বসলো, তার সর্ব্বস্ব দুষমনে লুটে নিয়ে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা না পেলে বিয়ে দেবে না, এ টাকা তার কর্জ্জ আছে।" অত টাকা তখন এক কথায় দেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন, তুমি বুঝেই দেখ। একবার ভাবলুম, যাক্‌গে, বিয়েয় কাজ নেই, ফিরেই যাই।—কিন্তু ইলাকে দেখলে সঙ্কল্প ঠিক রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। বেশ বুঝতে পারি, ও-ও যেন আকুল হয়ে আমার উপর

দৃঢ় নির্ভর করে বসেছিল,—হয়ত মুক্তি চাইছিল। শেষে অনেক কষ্টে টাকাটা জোগাড় করে তাড়াতাড়ি বিয়েটা চুকিয়েই ফেলি।. ও টাকা নিয়ে লিখে দিয়েছিল, কোনদিন কোন সম্পর্ক ও আমাদের সঙ্গে রাখবে না। তারপর অল্পদিনের মধ্যে মারাও গেল। সম্পত্তি কিছু অবশ্য যশোর জেলায় আছে। কে দেখছে। 'ইলাও সে-সব নিতে চায়নি।"

ব্যাপারটা কেমন যেন জটিল ও রহস্যপূর্ণ ঠেকলো। একটা ঐ রকম বাজে লোকের মেয়ে ইলা, অমন নম্র ভদ্র শিক্ষিত—এ কি করে হয়? হয়ত মায়ের দিক থেকে হয়ে থাকবে। জগতে কতই না বৈচিত্র্য দেখা যায়, কত ভাল ভাল লোকের মন্দ ছেলেমেয়ে হয়, আবার বিপরীতও তো ঘটে।

দিব্যেন্দু বললে, "টাকাটা সে নেহাৎ ঠকিয়ে নেয়নি, ঐ জমি-জমা জ্ঞাতিদের হাত থেকে উদ্ধার করতে ঐ টাকাটা সত্যই ওর ধার হয়েছিল।"

আট

কদিন ধরেই এই সব নানা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে গিয়ে শরীর মন কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কি শুভক্ষণেই না সুদীর্ঘ দিবসান্তে বন্ধুগৃহে পদার্পণ করেছিলেম। ইলার অবস্থা প্রায় সমান। অনেক যত্ন চিকিৎসায় এইটুকু হয়েছে যে ততটা ঘন ঘন মূর্চ্ছাটা বন্ধ হয়ে দিনে রাত্রে দু' একবারে দাঁড়িয়েছে। তবে মেয়েটার কথা প্রায় সে ভুলেই থাকে, আর সেইজন্যই মেয়েটার স্বাস্থ্যোন্নতিটা এতবড় বিপদের মধ্যেও বেশ দ্রুত গতিতেই হচ্ছিল। বিশেষতঃ আমার ঐ ওষুধটা খাবার পর থেকে।

এদিকের পুলিশ হাঙ্গামা সব চুকে-বুকে এসেছে, ডলির জন্যে

একজন বিদেশিনী গবর্ণেসের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল, ইতিমধ্যে দু'একখানা আবেদন-পত্র এসেও গেছে, লোক ঠিক হলে তার হাতে মেয়ে ও মেয়ের মাকে সঁপে দিয়ে আমি বিদায় নোব। অবশ্য সেকথা মুখে প্রকাশ করে বলবার উপায় নেই। দিব্যেন্দু তো প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, ইলাকে ভরসা করে বলাই হয়নি।

হঠাৎ সে রাত্রে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

বেশ জোর হাওয়া বয়ে চলেছে, দূর থেকে নদীজলের প্রবাহধ্বনি অন্যদিনের মত অস্ফুটভাবে নয়, একটু প্রবল হয়েই ভেসে আসছে। বৃষ্টি আসবার বিলম্ব নেই, মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনির সঙ্গে বিদ্যুদ্বিকাশ হচ্ছিল। শুনতে শুনতে কোন্ সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম বুঝতে পারিনি, হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে সজোরে করাঘাতের পর করাঘাতের দ্রুত অস্থির ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক মুহূর্ত্ত সময় লাগলো নিশ্চিত হতে। আমার দরজাতেই কেউ ধাক্কা দিচ্চে, না আর কোথাও।

দরজার খিল্‌টা খুলে দিতেই সবেগে কে ঘরে ঢুকে পড়লো এবং দুরন্ত ঝড়ো-হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণশিখায় জ্বালিয়ে রাখা ল্যাম্পের আলোটুকু নিবে গেল। অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে আমার মনে পড়ে গেল সেই অতীতের সন্ধ্যাটিকে,—যেদিন এইরকমই দোর ঠেলে অজ্ঞাত ব্যক্তির আকস্মিক অভ্যুদয় ঘটেছিল। সেদিনও ঠিক এই রকমই আলো নিবেছিল এবং সেই সঙ্গে মুমূর্ষু ফকিরের কাছে পাওয়া সর্প-বিষের প্রতিষেধকের হাতে-কলমে পরীক্ষার সুযোগ ঘটে আমায় আজ একজন আবিষ্কারকের উচ্চ সম্মানে সম্মানিত ও অর্থ-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান করে তুলেছে।

কিন্তু অতীতকে স্মরণ করে আমি আনন্দের পরিবর্ত্তে একান্ত

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেম, "কে? কে তুমি? শীগ্‌গির কথা কও, শীগ্‌গির বলো কে তুমি?"

ঘন ঘন দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বাতাসের শব্দে ঢাকা পড়েনি, তেমনি হাঁফ ধরার মধ্য দিয়ে উত্তর এলো, "আমি দিব্যেন্দু, কুঁজোর জলে মিশিয়ে রেখে আমায় কে কি খাইয়েছে।—উঃ জ্বলে যাচ্ছি,—জ্বলে যাচ্ছি,—আগুনের চাইতেও বেশী জ্বালা—"

আমার কণ্ঠ চিরে একটা অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি ব্যক্ত হতে না হতেই নিজেকে প্রাণান্ত বলে কঠিন করে নিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে ওকে টেনে এনে শুইয়ে দিলেম। দোর বন্ধ করে আলো জ্বাললেম। বিনা প্রশ্নে কোনদিকে চেয়ে না দেখেই আমার ডাক্তারী ব্যাগ খুলে প্রতিষেধক ওষুধটি বার করে কুঁজোর জল ঢেলে নিয়ে তাতে ফোঁটা ফেলতে ফেলতে এতক্ষণে দিব্যেন্দুর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেম, "জল খেয়েছ কতক্ষণ?"

"আন্দাজ দশ মিনিট হবে। উঃ! বুকের মধ্যের আগুন যেন ক্রমশঃ,—একি!—এ যে একটা বরফের চাঁই হার্টের উপর—"

আর কিছু না শুনেই ছুটে এসে ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়া দিব্যেন্দুর মুখে জলশুদ্ধ ওষুধটা ঢেলে দিয়ে তার ডান কব্জীর নাড়ীটা চেপে ধরলুম।—কি জানি, সময় পেলেম কি?

ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ অনর্গল বকেই চলেছে,—আমার সমস্ত মনপ্রাণ উদগ্র আগ্রহে ও আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে, নিজের শরীরেও যেন বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে মনে হচ্ছিল। অবসন্ন করাঙ্গুলি নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ শক্তি হয়ত হারিয়েই ফেলেছিল, হঠাৎ মনে হলো নাড়ী নেই! হাতখানা হিমশিলার মত অসহ্য ঠাণ্ডা। আর এক ডোজ ওষুধ প্রায় বন্ধ চোয়ালের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্টে তাকে খাইয়ে দিলেম।

এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ সেকেণ্ড, মিনিট, কোয়ার্টার কেটে গেল, নাড়ী ফিরে আসছে, শীতলতা আস্তে আস্তে বিদূরিত হয়ে আসছে, —আরো, আরো মিনিটের পর মিনিট কেটে চললো, ক্রমে ঘণ্টাও পূর্ণ হলো, দিব্যেন্দু গভীর শান্তির পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করে নিদ্রালুকণ্ঠে জড়িত স্বরে বলে উঠলো,—"বেঁচে গেছি! না রে?"

অপরিসীম আনন্দে ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গভীর স্বরে বলে উঠলেম, "হ্যাঁ, ঈশ্বরকে মহা ধন্যবাদ।"

"তোমাকেও সেই সঙ্গে—আঃ! ঘুমুই?"

"ঘুমাও—" বলে ওর মাথার তলায় বালিশ দিয়ে পা দুটো তুলে একটা চেয়ারে ঠিক করে রেখে ভাল করে শুইয়ে দিলেম। একমুহূর্ত্ত পরেই ঘুমন্ত মানুষের মত সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে লাগলো,—পুনরুজ্জীবিত দিব্যেন্দু সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভগবানের সঙ্গে সেই মিশর-পিরামিডের ধারেই হঠাৎ পাওয়া আসন্নমৃত্যু ফকিরের উদ্দেশ্যেও গভীর কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেম! তাঁর কথা কয়টি মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো:

"হিন্দু হও, মুসলমান বা খৃষ্টান হও, তুমি আল্লার প্রেরিত হয়ে এ-সময়ে যখন এসেছ আমার কাছে, নিশ্চয় সেই বিশ্বাসঘাতক সয়তানের দোসর হবে না। সে আমার শিষ্য সেজে এসেছিল, চুরি করে নিয়ে গেছে প্রাচীনকালের আবিষ্কৃত অতি ভয়ঙ্কর সর্প-বিষ হেমলক—যার এক তিল প্রমাণ খেলে সঙ্গে সঙ্গে বুকে আগুন জ্বলে উঠবে, আর পনের মিনিটের মধ্যে সেই আগুন হয়ে যাবে বরফ,—তার এই প্রতিষেধক আমি সারা জীবন ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় আবিষ্কার করেছি। এটা সে খুঁজে পায়নি, তাই নিতে পারেনি। আমার মাটিতে পোঁতা আসরফী আর ঐ বিষের কৌটা নিয়েই সে পালিয়ে গেছে। তুমি নাও এই অমৃত।—যখনই ঐ লক্ষণ দুটি দেখবে, বিনা

দ্বিধায় অবিলম্বে দুটি ফোঁটা দিয়ে দেবে। অন্য বিষেও যদি ঐ লক্ষণ থাকে, ফল দিতেও পারে। এর ফরমূলাও আছে ওরই মধ্যে ; যত্ন করে রেখ এবং আমার এই তপস্যার ফলকে ব্যর্থ হতে দিও না। এর বাড়া সুহৃদ মনুষ্য-সমাজে নেই বললেই চলে।”

এ সেই ব্যক্তি,—যে ফকিরের আতিথ্যের প্রতিদানে তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে ‘বিষ’ সংগ্রহ করে এনেছিল। এ সেই লোক যে একদা নিজেই ভুলক্রমে সেই বিষ খেয়ে ফেলে আমার কাছে প্রতিষেধক পাবার জন্য এসেছিল। জানি না, কি করে খবর পেয়েছিল ঐ বস্তুটি আমি আহরণ করতে পেরেছি। আর এই নির্জ্জন দ্বীপ-নিবাসের এই সকল ভয়াবহ রহস্যময় ব্যাপারের ব্যাপারীও সেই একই লোক। তা’ না হলে এই পিরামিড-বিষের উত্তরাধিকারী তো আজ পৃথিবীর মধ্যে আর দ্বিতীয় কেউ বর্ত্তমান নেই! এও সেই একই ব্যক্তি। ফকিরের সঙ্গে সঙ্গেই বাকশক্তি বিলুপ্ত না হলে এবং ঘণ্টা কয়েক পরেই মৃত্যু না ঘটলে তার সম্বন্ধে একটা দৈহিক বর্ণনা পেতে পারা যেতে পারতো, তাও তো ঘটেনি যে আমরা সেই আশ্চর্য্য আগন্তুককে চিনে নেবো!

দিব্যেন্দু দিন দুই অত্যন্ত দুর্ব্বল থেকে আস্তে আস্তে সামলে উঠতে লাগলো। আমি দিনরাত তাকে নিয়েই ব্যস্ত রইলেম। এর ভিতর একটি খাঁটি ইংলিশ লেডি (গবর্ণেস) বড় বড় সার্টিফিকেট নিয়ে এসে ডলির ভার তুলে নিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। বাড়ীতে যে রকম সর্প-যজ্ঞ চলেছে, এ বিদেশী মেয়ে আর যাই হোক না কেন, যজ্ঞেশ্বরের প্রেরিত স্পাই তো আর হবে না। ইলাকেও একটু দেখাশোনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই উনি করছেন দেখলাম। বয়স্কা মহিলা শিক্ষিতা, মনটিও হয়ত সহজাত সেবাধর্ম্মী।

ইলাকে ইচ্ছা করেই আমি ওর স্বামীর ব্যাপারটা সমস্তই সঠিক

জানিয়ে দিলেম। এর থেকে ওর মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। নিজের ভয় ভাবনা নিয়েই ও এলিয়ে থেকে স্বামীকে আদৌ গ্রাহ্য করে দেখছে না, সেই কথা মনে পড়লে নিজেকে শক্ত করে নিতে চেষ্টাও হয়ত মনে জাগবে। ফলেও ঠিক তাই-ই ঘটলো।

আমায় ও এক সময় জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা ওঁর হঠাৎ কি হ'ল বলুন ত? অসুখটা কি?"

গম্ভীর মুখে জবাব দিলেম, "যে অসুখে তোমার খোকা গেছে, যার প্রভাবে তোমার ডলি আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, সেই একই অসুখ। সাপের বিষ, মিশর-পিরামিডের থেকে পাওয়া প্রাচীন কালের এক অতি মহার্ঘ্য বস্তু—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, 'হেমলক' নাকি ওর নাম।

ইলা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠলো, "সয়তান! সয়তান! এত করেও ওর সাধ মিটলো না। আমার চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ না করে ও ছাড়বে না সে আমি জানি, আমি তা' জানি।"

একান্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্ত স্বরে ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেম, "ও,—কে?"

ইলা চোখ বুজে হাত দুটো কঠিন বলে মুঠো করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বোধ করি নিজের এতদিনকার ছড়িয়ে-পড়া স্নায়ুগুলোকেই শক্ত করে নিতে প্রাণপণে যুঝছিল, ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে থেকেই কঠিন বলে উচ্চারণ করলে, "দাদা! মরার বাড়া তো আর গাল নেই,—এতদূরেই যখন এসে পৌঁচেছি তখন আর কিসের ভয়? সব কথাই আমি আপনাকে আজ খুলেই বলবো। তারপর যা' হবার হয়েই যাক। শপথ ভঙ্গের পাপ যদি হয় নরকেই না হয় পচবো, তা'তেই বা কি? আর এমন করে দগ্ধাতে আমি পারছি নে। আপনি যদি এখানে না আসতেন, আজ আমার কি দশাই হতো!"

······না দাদা! বলা এত সহজ নয়! আমি আপনাকে সকল কথা লিখে জানাবো, মুখে বলতে বড্ড যেন বাধছে।"

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, "বেশ।"

নয়

সবিনয় নিবেদন,

পরম পূজনীয় দাদা! আপনাকে বলেছিলেম যে, 'বলা সহজ নয়, লিখে জানাবো', কিন্তু যার মূলেই প্রচণ্ড গলদ ও বিরাট লজ্জা বিপুল সঙ্কোচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কেমন করে ভদ্রসমাজের লোকচক্ষে প্রকটিত হতে দিই বলুন তো? দ্বিধায় ঘৃণায় অপমানে ইচ্ছে করছে নিজ কুলের এই কলঙ্ক প্রচার করবার পূর্ব্বেই কেন আমি মরলেম না। যে এতগুলো হত্যা করতে পারলে সে ইচ্ছে করেই না আমায় দগ্ধ করবার নিষ্ঠুর আনন্দে আমায় একটুখানি তার সেই অব্যর্থ বিষ—সে বলেছিল, ক্লিওপেট্রা নাকি ঐ নাম দিয়েছিল এবং বহু ব্যাপারে ব্যবহারও করেছিল বিপক্ষতাকারীদের উপর, কোন্ বৈদ্যের কাছ থেকে চুরি করে ঐ বিষপাত্রটি সংগ্রহ করেছিল, আর ওরই জোরে নিজের অনভিপ্রেত অনেককেই ও নিঃশব্দে ও অসন্দিগ্ধ-ভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে,—আজও দিচ্চে অথচ আমায় যে দিচ্চে না, একি আমার প্রতি করুণায়? না, না, সে-কথা ভুলেও ভাববেন না। কৃপা, করুণা ঐ পাষাণ-প্রকৃতি পাঠান-সর্দ্দারের পুত্রের মনের একটা কোণাতেও ছিটে-ফোঁটা পর্য্যন্ত নেই। কর্কশ কঠোর ফ্রন্টিয়ারের রুক্ষ পার্ব্বত্য-প্রকৃতির মতই তার দুর্দ্দান্ত সন্তান সে, যারা হাসতে হাসতে একটা মুরগীর বাচ্চার গলার চাইতেও মানুষের বুকে অনায়াস আনন্দে ছুরি বসিয়ে দেয়। মরণার্ত্ত শিকারকে পায়ে করে ঠেলে দিয়ে সেই কাঁচা রক্তমাখা ছুরি নিজের

পাগড়ী দিয়ে মুছে প্রেম-সঙ্গীত গাইতে গাইতে ইচ্ছাসুখে মন্থর-গতিতে প্রস্থান করে।

ও'আসলে তো তাদেরি একজন! সে রক্ত কোথায় যাবে? যদিও অতি শৈশব থেকে একান্ত ভদ্র বাঙালী পরিবারে পুত্রাধিক স্নেহে ও শিক্ষায় ও প্রতিপ্পালিত হয়েছিল, কিন্তু একটু বড় হতে না হতে রক্তের গন্ধে বাঘের মতই মেতে উঠে নিজের পৈতৃক হিংস্র-প্রকৃতির সন্ধান ও খুঁজে পেলে। কার সাধ্য রক্তের বিষ শোধন করে,—রক্ত যে কথা কয়।

সকল কথা একটু গোড়া থেকেই তা হলে বলি। আফ্রিদির যুদ্ধের সময় ইংরাজ বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এদেশেই বহু সামরিক কর্ম্মচারী ফ্রন্টিয়ারের বৃটিশ চাকরীতে চাকরী নিয়ে যায়। হাজরা সাহেব বা ক্যাপটেন হাজরাও তাদের মধ্যের একজন। তিনি শুদ্ধ রুগী বাঁচাবার বিদ্যায় নয়, নিরোগী জোয়ান যোদ্ধা মারবার বিদ্যাও বেশ ভালভাবে শিখেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বহুবার তার পরীক্ষা দিয়ে বৃটিশ মহলে খুব নামও করেছিলেন। হ্যাভেলক সাহেবকে যখন আফ্রিদিরা চুরি করে নিয়ে যায়, সেই নিরুদ্দিষ্টের সার্চ-পার্টিতে তিনিও স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছিলেন। ইতিহাসই বলেছে, জানেন হয়ত, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু যাকে এই অনুসন্ধানফলে না খুঁজতেই পাওয়া গেছলো তার কথা এ জগতে ক'জনই বা জানে। বহু গ্রাম ধ্বংস হলো, বহু দোষী-নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে নিহত হলো,—তবু তখন এটম ছেড়ে মামুলী বম্বিংএরও কেউ স্বপ্ন দেখেনি। মেসিনগানই সেদিনে যথেষ্ট ছিল।

এক গ্রাম্য-সর্দ্দারের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হাজরার রীতিমত যুদ্ধ হয়, দুর্দ্ধর্ষ বিরাট মূর্ত্তি সাত ফুটের ওপর লম্বা—পাঠান হলে কি হয়, তার সেকেলে গাদা বন্দুক হাজরা সাহেবের মার্টিনী রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলে না, তাঁর অব্যর্থ গুলিতে সে মরলো।

সেই সঙ্গে মহাকালের অদৃশ্য খাতায় আমার ভবিষ্যৎ আগুনের অক্ষরে লিখিত হয়ে গেল। তার ঘরে ছিল এক অপূর্ব্ব রূপসী হিন্দু-যুবতী। তাকে হিন্দুগ্রাম থেকে তার আত্মীয়-পরিজন সর্ব্বাইকে খুন করে তাকে হরণ করে এনেছিল ঐ পাঠান সর্দ্দার। মেয়েটি কাপ্টেনের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে তাঁর স্মরণ চাইলে, যতক্ষণ না স্বীকার হলেন, পা ছেড়ে সে কিছুতেই উঠলো না। সে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী পাঞ্জাবী কিশোরী, ষোড়শ বৎসর অনুত্তীর্ণাপ্রায় বালিকা। তিনি অগত্যা তাকে তাঁর ক্যাম্পে নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে একটি মাস কয়েকের নেহাৎ অপোগণ্ড শিশু। তাকেশুদ্ধ না এনে উপায় রইলো না। ক্যাপ্টেন অনেক চেষ্টা করেও তাকে ফেলে আসতে কিছুতেই ওকে বাধ্য করতে পারলেন না। সে এক হাতে শিশুকে বুকে চেপে অন্য হাতে তাঁর পা চেপে পড়ে রইলো। মানুষের দুর্ব্বলতাই তার সবচেয়ে বড় শত্রু। যে আফ্রিদি সর্দ্দারকে তিনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন, তারই পুত্রকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন—নিজ হস্তে অতি বিষাক্ত বিষবৃক্ষের চারাটি রোপণ করলেন!

যুদ্ধান্তে রাওলপিণ্ডিতে ফিরে আর্য্য-সমাজী মতে শুদ্ধি করিয়ে সেই নিরপরাধ মহা-অপরাধিনী সমাজ স্বধর্ম্ম স্বজনবিচ্যুতা অভাগিনী মেয়েটিকে তিনি বাধ্য হয়ে নয়, ভালবেসেই বিয়ে করলেন। এই সত্যকার কাহিনী অবশ্য সাধারণ্যে গোপনই রইলো। ছেলেটিও শুদ্ধি হলো, তার নাম দেওয়া হয়েছিল সূর্য্যকান্ত হাজরা। স্ত্রীর সত্যাগ্রহে বিপন্ন হয়ে রূপমুগ্ধ পতি চন্দ্রকান্ত হাজরা নিজ পুত্র বলেই তাকে লোকসমাজে পরিচিত করলেন। এরপর গোমতী হাজরার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হাজরা সাহেব তাদের দুজনের জন্যেই একত্র একইভাবে লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিজের

বাঙ্গালীত্বের অভিমান তাঁর সুদৃঢ় ছিল। এত দূরেও তিনি এদের জন্যে বাংলা মাষ্টার রেখে দেন এবং উত্তম ইংরাজী শিক্ষার জন্য কনভেন্টে ভর্ত্তি করেন। মা পাঞ্জাবী হলেও তারা যাতে বাংলা ও ইংরাজীতে সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কয় তার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। নিরক্ষরা স্ত্রীকেও লেখাপড়ার সঙ্গে পাঞ্জাবী বুলি পরিহার করাতে যথেষ্ট অধ্যবসায় দেখিয়েছিলেন। অতীতকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ধুয়ে ফেলতে চাইছিলেন।

স্থবি কিন্তু তার জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে পারলো না। যত বড় হতে লাগলো, ততই সে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠলো। প্রখর বুদ্ধি নিয়ে বিদ্যা ছেড়ে সে নিয়ত অবিদ্যারই চর্চ্চা করে চল্লো। তার পালক পিতা অনেক চেষ্টা করেও তাকে সেপথ থেকে ফেরাতে পারলেন না। তার মায়ের মেয়েকে সে দুটি চোখে দেখতে পারতো না। মৌখিকই নয়, যতদূর পারে শারীরিক অত্যাচারও তার উপর সে যৎপরোনাস্তি করে চলেছিল। তারপর···সংক্ষেপেই বলি, না হলে সত্তর পৃষ্ঠা লিখেও এ কাহিনী শেষ করতে পারব না। ছেলের অত্যাচারে অনাচারে মর্ম্মাহত মা একেবারে মর্ম্মে মরে গেলেন। ঐ ছেলের উপর কি জানি কেন যে তাঁর একটা উৎকট ভালবাসা ও অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মেয়ের প্রতি যেন সে তুলনায় ঢের কম। সে যাই হোক, মাতৃস্নেহ হয়ত কুসন্তানের প্রতি সমধিক হয়েই থাকে,—এইটেই ত প্রসিদ্ধি। কিন্তু মেয়ের প্রতি যে নিদারুণ অভিশাপের মতই মৃত্যুমুহূর্ত্তে তাকে দিয়ে কঠিনতম দিব্য দিয়ে শপথ করিয়ে গেলেন, কোন মা অন্ততঃ বাংলা দেশের মা হলে হয়ত তা পারতেন না। ঐ ছেলের সমস্ত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভার তার উপর ন্যস্ত করলেন। সে মেয়ের তখন বয়স বা কত, জীবনের অভিজ্ঞতাই বা কি, সে দাদাকে অন্তর দিয়েই ভালবাসে,—সহোদর ভাইয়ের প্রতি

সোদরার অকৃত্রিম স্নেহ। অনায়াসেই মায়ের মাথায় হাত দিয়ে ও তাঁর বলা বুলি কপ্‌চিয়ে গেল। যতদিন বাঁচবে সূর্য্যকান্ত যাই করুক, তার কোন ক্ষতি সে হতে দেবে না। তার বিয়ে দিয়ে ভাল বউ আনবে, তাদের অর্থকষ্ট না হয় সে বিষয়েও দায় ঘাড়ে নেবে। সানন্দেই সেই নির্ব্বোধ বালিকা আসন্ন-মৃত্যু জননীকে এই সমস্ত স্বীকৃতি দান করে অন্তর হতে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মহামন্ত্রের মতই এই মাতৃদীক্ষা গ্রহণ করলে। বিষবৃক্ষে ফুল ধরলো।—

সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যকান্ত মায়ের সমস্ত সোনা, জহরৎ, রূপার তৈজস-পত্র, হাজরা সাহেবের সোনার রিষ্ট-ব্যাণ্ড, বোতাম, পিস্তল, রাইফেল, বাড়ীর যাবতীয় মূল্যবান দ্রব্য এবং জাল সই-এ বাঙ্কের টাকাগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই চুরি করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

এরপর একদিকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ক্যাপ্টেন হাজরা পেনসন্ নিয়ে সুদূর পাঞ্জাব হ'তে বহুদিন পরিত্যক্ত বাংলার গ্রামে চলে এলেন। মেয়েকে নিজেই শিক্ষা দিতেন ও শেষজীবনে কুল-গুরুর কাছে প্রায়শ্চিত্ত বিধান নিয়ে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক সাধন ভজনে মনোনিবেশ করলেন। বাড়ী-ঘর সম্পত্তি দখল করতে অবশ্য মামলা না করে উপায় ছিল না।

কন্যার বিবাহ সহজেই জুটে গেল। বিবাহের অত্যল্পদিন পরে নিজের সঞ্চিত কিছু অর্থ প্রভৃতির সঙ্গে আজ যে-সব কথা আপনাকে লিখছি এই কাহিনী-লেখা একটি পত্র মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর পড়ে দেখো। সূযি তোমার ভাই নয়, কেউ নয়, শুধু তোমার মার জন্যই বাধ্য হয়ে তাকে আমি দুধ কলা দিয়ে কাল-সাপের মতই পুষেছিলেম। সাপের শোলুই সাপই হয়, এতদূর পালিয়ে এসেছি তার অত্যাচারের ভয়ে। হয়ত এখানে তার মুখ বার করবার সাহস হবে না।'

কয়েকদিন পরে ক্যাপ্টেন হাজরা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন।

স্বামীর সঙ্গে তাঁর বাড়ী যাবার দিন স্থির হয়েছে, হঠাৎ সূযি এসে দেখা দিল। তিন বৎসরে আরও রুক্ষ আরও বলিষ্ঠ সে হয়েছে। প্রথম সম্ভাষণে জানালে সে তার পৈতৃক সম্পত্তি দখল করতে এসেছে। আমি যাবার পূর্ব্বে যেন সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যাই। সে বিবাহ করেছে, বউ আনবে। সামান্য নগদ টাকা এবং নিজস্ব বস্তুগুলি ছাড়া সমস্তই তার জন্যে রেখে বিদায় নিতে উদ্যত হলাম। মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হতে থাকলেও মায়ের কাছের শপথ তো ভুলে যাবার নয়। ওঃ, মা হয়ে এত বড় শত্রুতা কেউ সন্তানের সঙ্গে করে?

সূযি নগদ টাকার হিসাব চাইলে। টাকার দলিল-পত্র অতি সামান্যই, তা'ও তো আমার স্বামীর দেওয়া পাঁচ হাজারেরই অবশিষ্ট টুকু—স্বামীর সঙ্গে পূর্ব্বেই আমার নিজস্ব সামান্য সামান্য জিনিষগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, নিজেরা দুজনে তাঁর মোটরে একটু এখানে সেখানে দেখে শুনে যাবো বলে। সূয্যি সে কথা মানলে না, অকথ্য কটুবাক্যে গালাগালি দিয়ে নালিশ করার ভয় দেখালে, বললে, 'জোচ্চর! সয়তানী! দেখাচ্চি তোকে মুখে লাথি মেরে, টাকা আমার আদায় হয় কি না। আমার পৈতৃক ধন, তুই নেবার কে?'

আর সহ্য করা গেল না। উঃ, কি নিদারুণ ভুলই যে একটি মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতির বশে উন্মাদ হয়ে গিয়ে করে বসলাম! এই সমস্ত তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া মাত্র। সর্ব্বনাশ তখনই আমার ঘটে গিয়েছে। অপমানের জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে কি করতে কি করেছি! সবেগে বলে উঠলাম, "পৈতৃকটা কার, কে তোমার পিতা? তোমার বাপ তো একটা আফ্রিদি ডাকাত,—তাকে মেরে ফেলে মাকে আর তোমাকে উদ্ধার করে এনে আমার বাবাই

তোমাদের দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তার যথেষ্ট ঋণ শোধ তো করেছ,—আর নয়, এই মুহূর্ত্তে চলে যাও। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।”

অতি নিকটে বজ্রাঘাতের শব্দে মানুষ যেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, সামান্য কয়টি মুহূর্ত্ত মাত্র তেমনি হতভম্ব হয়ে থেকে সূর্য্যকান্ত যেন প্রলয়াগ্নির মতই জ্বলে উঠল, “ইলা! মরবার সাধ হয়েছে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কেটে টুকরো টুকরো করে তোর হাড় মাস আঁস্তাকুড়ে ছড়িয়ে দেবো, জানিস্!”

আমারও কি জানি কেমন করেই তখন খুন ঘাড়ে চেপে গিয়েছে, সর্ব্বশরীর ভয়ে কেঁপে উঠলেও তখনও নিবৃত্ত হতে পারলেম না, নির্ম্মম হয়ে গিয়ে বলে উঠলেম, “নারী-হরণকারী নরঘাতক আফ্রিদি বর্ব্বরের ছেলে এ ছাড়া আর জানেই বা কি?—করবেই বা কোন্ ভাল কর্ম্ম।”

হঠাৎ নিজেকে কতকটা সংযত করে নিয়ে সূর্য্যকান্ত সম্বিৎ স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, “বাপ তুলে বারে বারে গাল দিচ্চো বোন হয়ে, এ’ও কি সম্ভব? যা বলছো তার প্রমাণ দিতে পারবে?”

আপদ চুকবে ভেবেই আর কিছু না ভেবে উৎসাহের সঙ্গেই উত্তরে বললাম, “বেশ, লিখিত প্রমাণই তোমায় দিচ্চি।” ছুটে গিয়ে বাবার সেই সাঙ্ঘাতিক স্বীকারোক্তি নিয়ে এসে ওর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিলেম। তার পর দূরে সরে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে নিজেকে বিজয়ী-বোধে প্রতীক্ষার সঙ্গে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে আরম্ভ করেছি, কানের মধ্যে আগুনের একটা হল্কার মতই ছুটে এসে প্রবিষ্ট হ’ল—“বাঁচালে আমায় তুমি শ্রীমতী ইলা দেবী! আমি যে প্যানপেনে বাঙ্গালী কুত্তার বাচ্চা নই, খাঁটি সীমান্ত পাঠানদের খাঁটি আফ্রিদি বাচ্চা, এর চেয়ে প্রার্থনীয় আমার পক্ষে

আর কিছুই হতে পারে না। ভেবে পাইনি কি করে কোথা থেকে ভেতো-বাঙ্গালী হয়ে আমার রক্তে এ খুনের জোয়ার বয়ে আসে! আমার এ রক্তে খুনের এ আগুন জ্বলে কোথা থেকে,—ভাঁটাপড়া পচা পুকুরের শ্যাওলা-পড়া পাঁকের বদলে! যাক বেঁচে গেছি! তোমার স্বামী, যদি সন্তান জন্মাতে সময় মেলে তো তারা, এবং অবশেষে তুমি হাজরা-বংশের ঝাড়ে-বংশে সক্কলেই আজ থেকে আমার পিতৃহত্যার পরিশোধে আমার ভিকটিম হয়ে খোদাতালার পায়ে উৎসর্গিত হয়ে রইলে। প্রতিশোধ—পিতৃহত্যার নির্ম্মম প্রতিশোধ!"

সূর্য্যকান্ত দম্ভভরে জুতা ঠুকে চলতে উদ্যত হয়ে মুখ ফিরালো।

এক মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনের সারা তুনিয়াটাই বিপুল বেগে ঘূর্ণিত হয়ে উঠলো। পায়ের তলায় পৃথিবী যেন ভীষণ ভূমিকম্পে প্রচণ্ড তুলে উঠল। উঃ, সর্ব্বনাশী আমি এ'কি করলেম? হা ঈশ্বর! এ কি মতিচ্ছন্ন ধরলো আমার? আকুল আর্ত্তনাদ করে ছুটে এলাম,—"দাদা! দাদা!—ক্ষমা করো, বুদ্ধিহীনা নারী আমি, আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দান করছি, তুমি সব নাও—সব নাও—আরও যা চাও তাও দোব। ক্ষমা ক্ষমা—"

কে কোথায়?

অদূর হতে একটা হিংস্র তীব্র বৈশাখী ঝড়ের ঝাপটার মত রুদ্র জ্বালাময় বিদ্রূপ হাস্য ছুটে এসে আমার সর্ব্বশরীরে ও ভয়ার্ত্ত-চিত্তে অগ্নিবাণের মতই ঝাঁপিয়ে পড়লো, আমি সংজ্ঞাহারা হলাম।

"ডাক্তার! ডাক্তার! অবিলম্বে তোমার অ্যানটি-হেমলক বার করো, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—শীগ্‌গির—"

আকস্মিক সেই তথাকথিত অগ্নিবাণেরই একটা সুতীক্ষ্ণ শব্দ-শরের ফলা এসে তীব্রবেগে কানের মধ্যে বিঁধল। এই রহস্যঘন

জীবন-কাহিনীর অদ্ভুত পরিবেশে মাথা কি আমার বিগড়িয়ে গেল নাকি ? অথবা আমার অবচেতন মনের গুহায় রক্ষিত সেই পুরাতন দৃশ্যপট—

"ডাক্তার ! এক মিনিট সময় নষ্ট করবার অবসর আর নেই। হয় আমায় বাঁচাও, নয় নিজে মর !"

একহাতে রিভলবার বাগানো, অপর হাতটা আর্ত্তভাবে নাড়া দিতে দিতে স্খলিত-কণ্ঠে সেই আমার হেমলক প্রতিষেধকের প্রথম রোগী আমার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে কিন্তু এক লহমার দৃষ্টিতেই বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি তার আর তখন শরীরে অবশিষ্ট ছিল না, বেতসপত্রের মতই সুদীর্ঘ দেহটা সঘনে কম্পিত হচ্ছিল।

একটা দারুণ আতঙ্কে আমার হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল,—গভীর বিস্ময়ের তাড়না থেকে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করে সাশ্চর্য্যে বলে উঠলেম, "এ কি ! তুমি এই নিশ্ছিদ্র বন্ধ বাড়ীতে কি করে ঢুকলে ?"

ঘোর অমঙ্গল-ভরা বিদ্রূপপূর্ণ উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হয়ে মধ্য পথেই যেন সহসা থেমে গেল। "নির্ব্বোধ ! এ বাড়ীর প্রত্যেকটি রুদ্ধ দ্বার আমার গতি যদি রোধ করতে পারতো তা'হলে এত কাণ্ড করলাম কি করে ? নীল গুদামের ভাঙ্গা বাড়ী দিয়ে এ বাড়ীর কর্ত্তার ঘর পর্য্যন্ত যে গুপ্তপথ আছে, তার খবর রাখো সার্লকহোম্‌স্ ? কেয়াতলার জমিতে তার একটা গুপ্ত দরজা আর ঐ—ঐ ঘরের পাশের করাইডরে দ্বিতীয় আর একটা। কিন্তু, করছো কি ? ভেবেছ কি আমি যদি মরি তোমায় ছেড়ে রেখে যাবো ? না, না, না,—"

সূর্য্যকান্ত নলটা আমার ললাট লক্ষ্যে তুলে ধরল।

"দেখছো না নিজের বিষে নিজেই জ্বরে' যাচ্ছি ! গোখরো সাপ

কামড়েছে। তোমার জন্যে হেমলক চূর্ণে মেশাব বলে বিষদাঁত থেকে বিষ সংগ্রহ করছিলুম যাতে পনের মিনিট সময়ও না পাও। ভুক্ত-মাত্রেন—উঃ! ওঃ! ডাক্তার! শোন,—আমায় একবার তুমি বাঁচিয়েছিলে, আর একবার বাঁচাও, দয়া করো। শপথ করছি ইলাকে আমি ক্ষমা করবো। ভারতবর্ষ থেকে চলে যাব, ওঃ দোহাই আল্লার,"—সে সবেগে মাটিতে বসে পড়ল, বসে বসে ও মাতালের মত টলতে লাগল।

আমার মানবিকতা প্রচণ্ড বলে আমার অন্তরে এসে আঘাত করলো। ফকিরের আদেশ মনে পড়লো। 'সকল প্রকার বিষক্রিয়ায় এই ঔষধ মন্ত্রৌষধি হবে। শ্রুতমাত্র তুমি দিতে ঈশ্বরের কাছে বাধ্য থাকিবে।' দ্রুত উঠে পড়লাম। হয়ত সেই ঈশ্বরের কাছে এবং মানব সমাজের কাছে ঘোর অপরাধে অপরাধী হতে চলেছি জেনেও গুরুর আদেশ আমার বিবেক অগ্রাহ্য করতে পারল না। বললাম, "শোন সূর্য্যকান্ত! ওষুধ তোমায় আমি দোব, কিন্তু—"

সূর্য্যকান্ত মরণাহত বাঘের মতই গর্জ্জে উঠল, "সূর্য্যকান্ত! কে তোমার সূর্য্যকান্ত? আমি গিয়াসউদ্দিন আব্বাস খান,—কাফেরের দেবতার নাম দিয়ে আমায় সয়তান বানাতে চেয়েছিল সেই বাঁদীর বাচ্চা বেঁড়ে সয়তানটা—ইয়া আল্লা! শালা সাপ আমায় কিনা শেষে তার কাছে হার মানালে।"

সূর্য্যকান্ত অথবা গিয়াসউদ্দিন আব্বাস খান, অকস্মাৎ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তীব্র একটা আর্ত্তরব করে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল, তার শাকবর্ণ মুখ একবার সুতীব্র বিক্ষোভে আকুঞ্চিত হয়েই থেমে গেল। নীল ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে খানিকটা সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ল।

